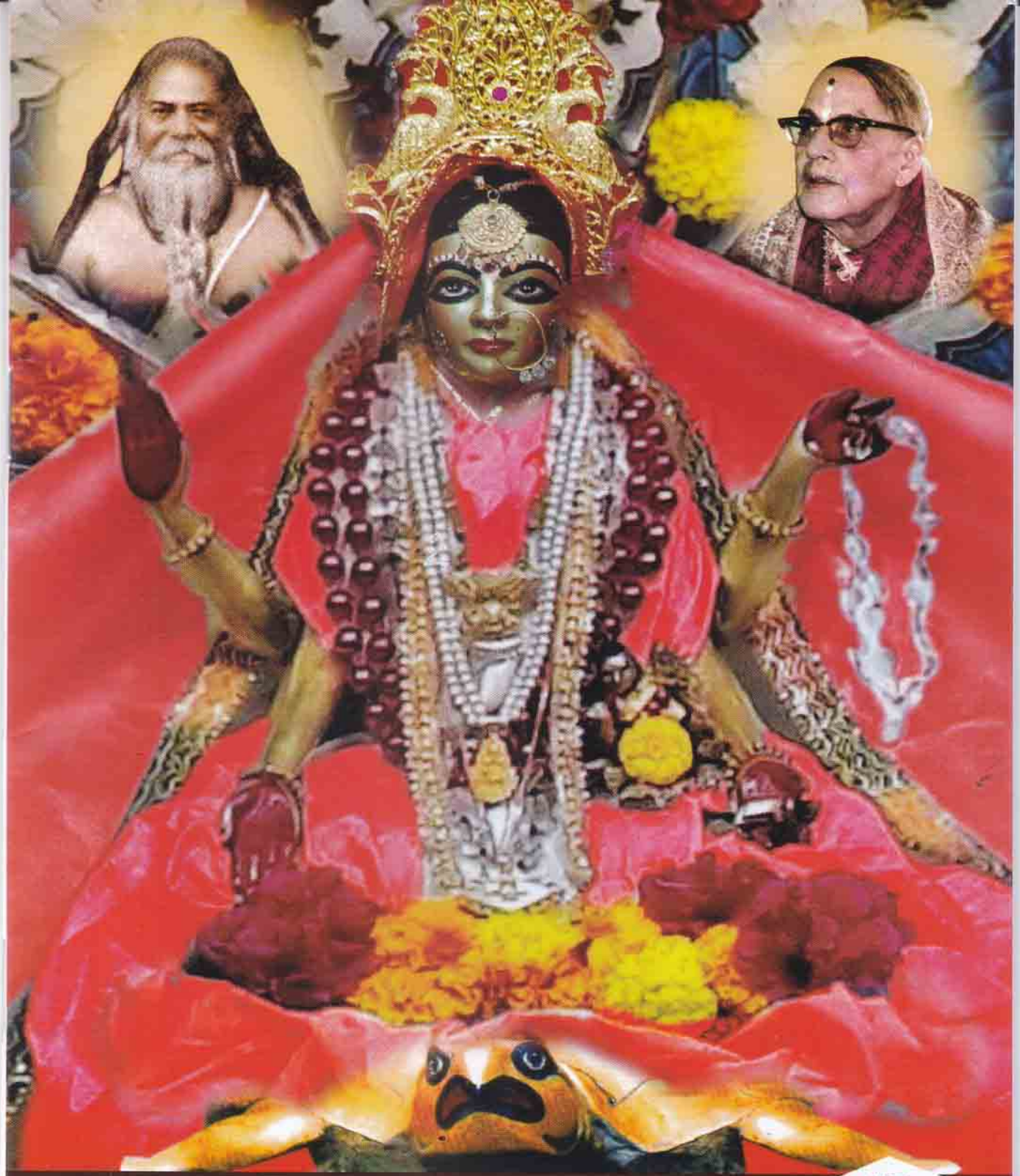

শ্রীশ্রীবালেশ্বরী পত্রিকা

শুভ
গুরুপূর্ণিমা তিথি
২০২২

"জাগরণে যারে দেখিতে না পাই
থাকি স্বপনের আশে,
ঘুমের আড়ালে যদি দেখা দেয়,
বাঁধিব স্বপন পাশে।
এত ভালবাসি, এত যারে চাই,
সদা মনে হয় সে যে কাছে নাই;
যেন এ আমার আকুল আবেগ,
তাহারে আনিবে ডাকি,
দিবস রজনী আমি যেন কার আশার আশায় থাকি।"

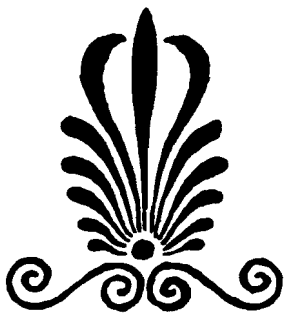

শ্রীশ্রীগুরুচরণাশ্রিত—
সুমিত্রা, নীলাঞ্জন, সোহিনী, অঙ্কিত ও আরভ্
মুম্বাই

শ্রীশ্রীবালেশ্বরী পত্রিকা

৬১তম বর্ষ ● শুভ গুরুপূর্ণিমা ১৪২৯ সন ● দ্বিতীয় সংখ্যা

উপদেষ্টা — শ্রীসিতেন্দু গুপ্ত

শ্রীশ্রীমোহনানন্দ সমাজ সেবা সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত

এ.ই. ৪৬৭ সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০ ০৬৪

ফোন: ২৩২১-৫০৭৭/৫১২৩, মোবাইল: ৮০১৭২২৭০৯৯

E-mail: sreesreemohananandatrust@gmail.com / mohananandasamaj@gmail.com

সেক্রেটারী: শ্রীসিতেন্দু গুপ্ত

সম্পাদিকা: শ্রীমতী কনিকা পাল

মুদ্রণ: জয়শ্রী প্রেস, ৯১/১বি বৈঠকখানা রোড, কলকাতা ৭০০০০৯। ফোন: ৯৮৩০১৮৮৭২৪

সূচীপত্র

সতাং প্রসঙ্গ	শ্রীমতী মালাদেবীর প্রশ্ন	৩০
চতুরাশ্রম - আজকের মতো	শ্রীবিবেকাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	৩২
শ্রীরামচন্দ্রের গঙ্গাপার	শ্রীসোমনাথ সরকার	৩৫
প্রাতঃস্মরণীয়	শ্রীমতী কস্তুরী রায়	৩৭
অথ রামায়ণী কথা অন্ধমুনির শাপ	শ্রীমতী অনসূয়া ভৌমিক	৩৮
পুণ্য পরশ পুলক	শ্রী বসুমিত্র মজুমদার	৪০
'সংস্কার'	শ্রীমতী রীণা মুখোপাধ্যায়	৪২
God I have seen without knowing	Sri Aniruddha Ray	৪৪
গীতার মর্ম	শ্রী দেবপ্রসাদ রায়	৪৫
"ডাক দিয়েছ কোন সকালে"	শ্রীশিবদাস রায়	৪৮
সমর্পণ	শ্রীমতী অরুণিমা বসুমল্লিক	৫১
গুরুই কর্ণধার	শ্রী অঞ্জন সাহা	৫২
Mohanananda Cancer Diagnostic (Donors List), Durgapur		৫৩
মহাশক্তি	শ্রীবিলাস	৫৩
শ্রীগুরুচরণভরসারে	শ্রীগুরুচরণাশ্রিতা কণিকা পাল	৫৪
চিরবাঞ্ছিত (সম্পাদকীয়)		৫৬

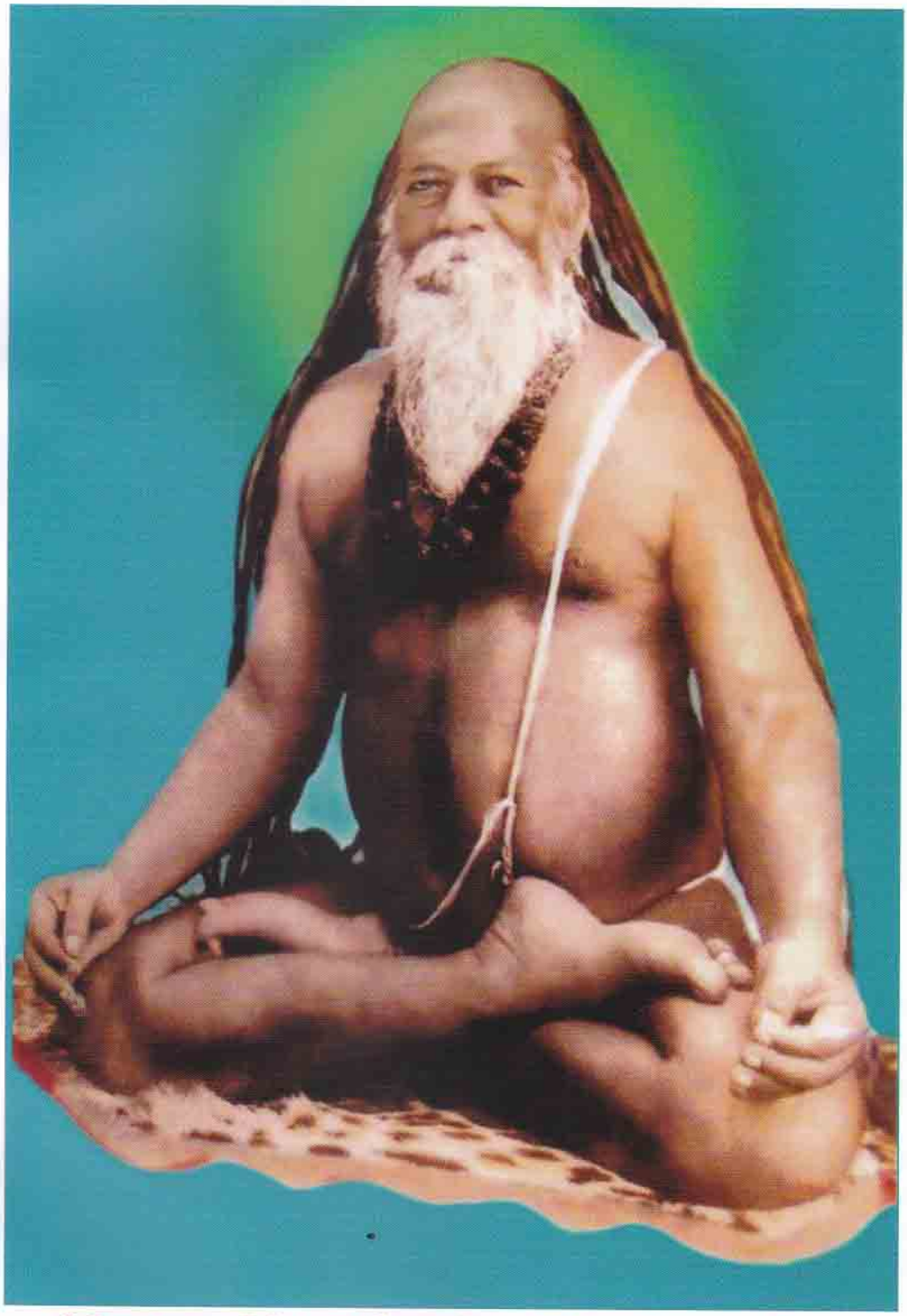

শ্রীশ্রী বালানন্দ ব্রহ্মচারীজীর স্মরণে শ্রী অরূপ সেন ও শ্রীমতী কাবেরী সেনের— সৌজন্যে।

সতাং প্রসঙ্গ

শ্রীমতী মালাদেবীর প্রশ্ন

প্রশ্ন ১) নামে আনন্দ কীকরে আসে? আনন্দের স্বরূপ কী?

উত্তর ঃ ভগবন্নামে পাবনী শক্তি আছে। নিয়মিত নাম উচ্চারণ স্মরণ ও অনুশীলন দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ হয় এবং এই শুদ্ধ চিত্ততাই পবিত্র আনন্দরসের আস্বাদন দেয়। এ আনন্দ স্বসংবেদ্য, অপরের নিকট প্রকাশ করা যায়না, যেমন রসাস্বাদন পরের নিকট প্রকাশ করিতে পারা যায় না। এই আনন্দ আত্মনিষ্ঠ, বহির্বস্তু সাপেক্ষ নহে। যিনি সচ্চিদানন্দরূপে রস স্বরূপে আমাদের মধ্যে নিত্য বিরাজিত তাঁর অনুস্মরণের অবলম্বনরূপ নামযোগ সূত্র সেই আনন্দের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দেয়। "রসো বৈ সঃ অস্য লব্ধায়ং আনন্দী ভবতি।"

প্রশ্ন ২) যদি কেউ শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতাকে গুরু মানে তাহারও কী দেহধারী গুরুর প্রয়োজন আছে?

উত্তর ঃ শ্রীগুরু দেহধারী হইবেন এবং তিনি সাধনাসিদ্ধ পরম্পরাপ্রাপ্ত ঋষিছন্দ কীলক বিনিয়োগ প্রভৃতি পরিজ্ঞাত মন্ত্রার্থ জ্ঞান লাভ করিয়া উপনীত শিষ্যের কর্ণে সেই মন্ত্র প্রদান করিবেন, শিষ্যের শ্রুতিগোচর করাইবেন - ইহাই দীক্ষাদান বা দীক্ষাগ্রহণ বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অনুশাসন কোনও দেহধারী গুরুপদবাচ্য ঋষিরই উক্তি। তথাপি উহা শাস্ত্র, - দেহধারী মানব নহেন। তাই গীতাকে শ্রীগুরুর আসন দেওয়া যায় না। "পারাশর্য্যবচঃ সরোজ কমলং গীতার্থ গন্ধোৎকটং।" গীতার রচয়িতা, ব্যাসদেব দেহধারী মানব বিধায় গুরুপদবাচ্য হইতে পারেন।

"নমোহস্তুতে ব্যাস বিশালবুদ্ধে
ফুল্লারবিন্দয়ত পদ্মনেত্র
যেন ত্বয়া ভারততৈলপূর্ণঃ
প্রজ্জ্বলিতো জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ।।"

এই প্রশ্ন দুটি করেছেন শ্রীমতী কমলিকা দেবী।

প্রশ্ন ৩) আমরা কোন স্তরে পৌঁছলে ও কি সাধনার দ্বারা এই স্থূলচক্ষে গুরুকে ইষ্টমন্ত্র স্বরূপে, ব্রহ্মা-বিষ্ণু স্বরূপে দর্শন করে সেই অখণ্ডমণ্ডস্থূলাকার চৈতগুরুকে উপলব্ধি করতে পারি?

উত্তর ঃ দেহধারী সকলের মধ্যেই পঞ্চকোষ বিদ্যমান - অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়। শ্রীগুরুর সঙ্গে শিষ্যের তন্ময়তা ও তদাত্ম্যভাব যে যে স্তরে হইবে শ্রীগুরুর ভাবধারাও শিষ্যের মধ্যে তদনুসারেই অনুক্রমিত হইবে। অন্নময় কোষের সঙ্গে তন্ময়তা হইলে শ্রীগুরুর শারীরিক সুস্থতা অসুস্থতা, বেদনা, স্বাচ্ছন্দ্য শিষ্যের অন্নময় কোষের সঙ্গে তন্ময়তা দরুণ তদনুসারেই অনুভূত হইবে, সংক্রামিত হইবে। প্রাণময় কোষের সঙ্গে তন্ময়তা হইলে ক্ষুধা, পিপাসা স্থিরতা অস্থিরতা সবই অনুভূত হইবে। মনোময় কোষের সঙ্গে তন্ময়তা হইলে শ্রীগুরুর মনোভাবগুলি শিষ্যহৃদয় দর্পণে প্রতিফলিত হইবে। শিষ্যের চিন্তাধারা যেমন শ্রীগুরুর মনোমধ্যে উদিত হইবে শ্রীগুরুর চিন্তাধারাও সেইরূপ শিষ্য হৃদয়ে সংক্রামিত হইবে। শ্রীগুরু দেহধারী বিধায় যদি স্বেচ্ছাকৃত বা সংস্কার জনিত

কোনও মনোবিকার উপস্থিত হয় তবে তাহাও শিষ্যের হৃদয়ে প্রতিফলিত হইবে। বিজ্ঞানময় কোষের সঙ্গে তন্ময়তা হইলে চৈত্যগুরু বা চেতনাত্মা বিশ্বব্যাপী অখণ্ডমণ্ডলাকারে বিরাজিত চৈতন্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হইতে পারে। এই অবস্থাতেই তাঁকে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর রূপে দর্শন করিতে পারা যাইতে পারে। শ্রীগুরুর আনন্দময় কোষের সঙ্গে তন্ময়তা হইলে ভিন্ন দর্শন বোধ আর থাকে না। শ্রীগুরু ও শিষ্য অভিন্ন একাত্ম হইয়া যান। এই পঞ্চস্তরের অবস্থা বর্ণনীয় নহে, অনুভবনীয় তাই অপরকে বাক্য দ্বারা বুঝানো যাইতে পারেনা।

প্রশ্ন (৪) আমরা আমাদের স্বপ্ন সুষুপ্তি দ্বারা তাঁর মাধুর্য্য উপলব্ধি করে আনন্দে ডুবে যাই। কিন্তু আবার সেটি হারিয়ে ফেলে হাহাকার করি - সে আনন্দ স্থায়ী হয়না। কি সাধন দ্বারা কোন স্তরে পৌঁছালে এই স্থূলচক্ষে গুরুদেবের স্থূল দেহস্বরূপেই ইষ্টমন্ত্র প্রত্যক্ষ হবে? এই বাহির বিশ্বে সর্বভূতে গুরুদর্শন হবে ও ঠিক ঠিক উপলব্ধি করে অখণ্ডমণ্ডলাকার বাক্যের সার্থকতা হবে?

উত্তর ঃ স্বপ্ন বা সুষুপ্তিতে যে আনন্দ ও মাধুর্য্য উপলব্ধ হয় তাহা চিত্তেরই সংস্কার মাত্র। জাগ্রৎকালীন আমাদের ভাবনা ও প্রত্যক্ষ অনুভূতিগুলি অন্তরে সংস্কারের সাধন করে। সেই ভাবনাগুলি বীজাকারে সুপ্ত থাকে। সুষুপ্তি ও স্বপ্নাবস্থায় স্থূল জগৎ ও স্থূল মনের বাধা বিমুক্ত হওয়ায় সেই সংস্কার বীজাকারে নিহিত ভাবগুলি নির্বাধ সূক্ষ্ম শরীরে সাক্ষাৎ অনুভব গোচর করাইয়া থাকে। তাই তদবস্থায় আমরা যে অনুভব করি জাগ্রৎকালে ফিরিয়া আসিলে সেই অনুভব হারাইয়া ফেলি, কারণ জাগ্রৎ ও স্বপ্ন ভিন্ন অবস্থার স্তর। একমাত্র সমাধি দ্বারাই এই অনুভবকে আমরা চিরন্তন করতে পারি। তথাপি সবিকল্প সমাধিতেও অনুভূতির ভাবান্তর ঘটিবে, নির্বিকল্প সমাধির দ্বারাই ভাব ও ভাবনাকে ধরিয়া রাখিতে পারা যায়।

"যথা দীপো নিবাতস্থোনেঙ্গতে সোপমাস্মৃতা।
যোগিনঃ যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ।।
যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি।।
সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্‌বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ং।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ।।"

"অপনেকো মারনকে ওয়াস্তে জরাসা অস্ত্র; দুস্‌রেকো মার্‌নেকে ওয়াস্তে বড়া বড়া শস্ত্র।"
নিজেকে মারবার জন্য অর্থাৎ আপন অজ্ঞান দূর করার জন্য সামান্য অস্ত্রই যথেষ্ট। আর অন্যকে বোঝাবার জন্য অনেক বাক্য বিন্যাস, যুক্তি-তর্ক, শাস্ত্রবচনের উদ্ধৃতি তৈয়ারির প্রয়োজন হয়। - শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী

চতুরাশ্রম - আজকের মতো

শ্রীবিবেকাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

আর্যঋষিরা মানুষের তৎকালীন জীবন শৈলী গভীর মনোযোগের সাথে সমাজ বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে দেখে দেখে অমূল্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। তারই ফসল চতুরাশ্রমী জীবন যাপন। জীবনের যে চারটি স্তরের কথা বৈদিক যুগে মানার কথা বলা হয়েছে তার কঠোর অনুশাসন আমরা অল্পবিস্তর জানি। আজকের যুগে তা মানা আর সম্ভব হয় না। কাঠামোটিকে ঠিক রেখে আজকের জীবনযাত্রার ধাঁচে একে সাজাবার কথা নিয়েই এই লেখা।

আয়ুষ্কাল

শরৎ কালের আর্যাবর্তের শস্য শ্যামল ভূমি ও নির্মেঘ আকাশ হয়ে উঠে সকলের আনন্দের ঋতু। বেদে শত শরৎকাল দর্শনের আকাঙ্খা প্রকাশিত হয়েছে, অর্থাৎ বৈদিক যুগে শত বছরের কম পরমায়ুই স্বাভাবিক ছিলো। মানুষের গড় আয়ু (সবচেয়ে বেশী ধরে) সত্তর/আশির মধ্যেই ছিল। পরে রোগ ও মহামারীর জন্য তা কমে যায়। এই গড় আজকের যুগে আরও বেড়েছে নানা জীবনদায়ী ঔষধের কল্যাণে মারাত্মক প্রাণঘাতী কিছু রোগকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নির্মূল ও দমিত করার জন্য। আজকের মানুষজনের জীবন যাত্রার দিকে তাকালে চোখে পড়ে যে, তাদের জীবনের প্রায় তিনভাগের দু'ভাগই ব্যয়িত হয় নিজেকে সমাজে পথচলার মতো করে সাজিয়ে নেওয়াতে, তার মানে পড়াশুনা, উপার্জন, সংসার করা ও পরিবারের সভ্যদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে। অতএব হিসাব করলে (বৎসরে) দাঁড়ায় শৈশব (১০) সাজিয়ে নেওয়া (৫০) = ৬০, যা আধুনিক কালে অবসরের বয়স। জীবনকালের বাকীটুকু বাণপ্রস্থ (১০) + সন্ন্যাস (১০)।

পরিকল্পনা করার সময়

বাল্যশিক্ষার শেষে মানুষের সঠিক পথচলা শুরু হয়। লেখাপড়া চলাকালীন আঠারো বছরেই সে সাবালক/সাবালিকা হয়ে উঠে। তখন থেকেই বেশ কিছু বিষয়ে তার নিজের সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা এসে যায়। এই সময়েই তাকে জীবনের সঠিক দিশা ঠিক করে নিতেই হয়। নিজেকে তৈরী করারজন্য কঠিন লড়াই করার মতো মনের জোর তৈরী করতে হয়। সব সময় লক্ষ্য স্থির রাখতে হয়।

জীবনে যা কিছু অর্জনের সম্ভাবনা/পরিকল্পনা আছে তা ৩৫-বছর বয়সের মধ্যেই ঠিক করে নিতে হবে এবং উপযুক্ত পদ্ধতিতে তা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। পঞ্চাশ বছর বয়সের মধ্যেই কোন মানুষ সাধারণতঃ তার সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছায়, তারপর অনেকটাই নিয়মমাফিক জীবন চলে। এই লড়াইটা তুঙ্গে থাকে চল্লিশ বছরের মেয়াদে ১০ + ৪০ = ৫০ = বৎসর।

পথচলায় বোধে আসা

নিজেকে তৈরী করার সময় বা করার পর যে কোন স্তরেই মানুষ প্রকৃতির চালে চলতে বাধ্য হয়। এই বাঁধন ছিঁড়ে বেরোবার উপায় থাকে না। প্রকৃতি তার চলন বজায় রাখে নিজের মতো করে। আমরা ইচ্ছামত সেখানে নিজের নিয়ম ঢুকিয়ে দিতে পারি না বলেই শীতকালে জাম পাই না, গ্রীষ্ম-বর্ষাতেই

পাই। তাই সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভবিষ্যতের কাজ সেরে নিতে হবে। জীবনে অপরাহ্নের ডাক এলে প্রভাতের কাজ আর করা যাবে না এবং করার চেষ্টা করলে ব্যর্থ হয়ে হাহাকারে জীবন ভরে যাবে। এই অবস্থাতেই মানুষ বুঝতে শুরু করে যে পারিপার্শ্ব আর তাকে সহজভাবে নিচ্ছে না, আবর্জনা ভাবছে, যেমন প্রকৃতির প্রয়োজন ফুরালে সে উদ্ভিদ ও প্রাণীকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এগিয়ে যায়। তাই স্পষ্ট করে বলা যায়, যে আধুনিক যুগে মানুষের অর্ধেক জীবন যায় পথ ঠিক করতে আর বাকীটা চলে যায় প্রৌঢ়ত্বের ছায়াতলে। এই বুঝবার চেষ্টাতেই মানুষের জীবনে একটা ফাঁকা অবস্থার সৃষ্টি হয়, যার ফলে সে বাধ্য হয় অতীতকে ফিরে দেখতে। এখানেই জীবনের সারবস্তুর উপলব্ধি শুরু হয়। ধীরে ধীরে আত্ম উপলব্ধির দিকে মন চলে যায়। সংসার আর আগের মতো মন কাড়ে না। এই বিবেচনার মাধ্যমেই প্রাচীন ঋষিরা বুঝলেন যে দৈর্ঘে ছোট বড় করে মানুষের জীবনকালকে চারভাগে ভাগ করে চলা সব দিক থেকে সুবিবেচনার কাজ হবে। তার থেকেই এলো চতুরাশ্রম। এই সুন্দর জীবন-বিন্যাস পৃথিবীর কোন দেশেই প্রাচীন কাল থেকেই দেখা যায় না।

ব্রহ্মচর্যের সময়কাল

বছর নয়েক বয়স হ'লেই ছেলে মেয়েদের জীবন গঠনের কাজ শুরু করতে হবে। প্রাচীনকালে গুরুর আশ্রমে এ টি সম্পন্ন হোত বলে বাবা মা নিশ্চিন্ত থাকতো। আজকের যুগে শিশুকে উপযুক্ত সদ্‌গুরুর কাছে দীক্ষা দিইয়ে নেওয়া সব থেকে ভালো উপায়। (মনে রাখতে হবে স্বামী দেবানন্দ মহারাজের বাণী, ধর্ম সংকীর্ণ মনকে ব্যাপ্তমনে পরিণত করে, ধর্ম আশি বছর বয়সে আচরণের জিনিস নয়। ধর্ম কি? না, মানুষ হ'বো। মানুষ হওয়ার সিদ্ধান্ত জীবনের শুরু থেকেই নিতে হবে, আশি বছর বয়সে নয়) । এর পর বিদ্যা শিক্ষালয়ে ও মা বাবার মিলিত চেষ্টায় কঠোর নিয়ম পালন করিয়ে মানসিক, দৈহিক ও চারিত্রিক দৃঢ়তা আনার মাধ্যমে তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। পাঁচ বছর বয়সের পর থেকে মানুষের সঙ্গে আচার-ব্যবহার, সহবত, নাগরিক জীবন যাপনের রীতিনীতি ও সুস্বাস্থ্য পাবার পদ্ধতি শেখাতে হবে, নিজেরা তার সামনে করে দেখিয়ে ভালো ভালো গল্প ও উদাহরণ দেখিয়ে দেখিয়ে, নানাভাবে এই ব্যাপারগুলো আদরযত্ন করে শিশুর মনে ধরিয়ে দিতে হবে।

সঠিকভাবে পদচারণা

এই সময় (ক) মনঃ সংযমের উপর গুরুত্ব দিতে হবে (শম);

(খ) ইন্দ্রিয় বশের কৌশল আয়ত্ব করাতে হবে (দম);

(গ) ইন্দ্রিয়ের প্রভাবে মন যেন বিদ্যাভ্যাস থেকে বিচ্যুত না হয় তার চেষ্টা করাতে হবে, নিয়ম করে (উপরতি);

(ঘ) শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা ইত্যাদি প্রাকৃতিক পরিবর্তন, মান-অভিমান, সুখ-দুঃখ ও ভালো মন্দকে অবজ্ঞা করার দৃঢ় মানসিকতা তৈরীর চেষ্টা করাতে হবে (তিতিক্ষা);

(ঙ) রাগ হিংসাকে যথাযথভাবে সামলানোর মত মানসিকতা তৈরী করতে হবে, যাতে করে চিত্তের একাগ্রতা নষ্ট না হয়। এইভাবে সাময়িক উত্তেজনার বিষয়গুলিকে অগ্রাহ্য করার মনোভাব মানুষের মনকে ঈশ্বরমুখী করে (সমাধান);

(চ) মনে রাখতে হবে জল, উঁচু থেকে নীচেই নামে। জ্ঞানবারি ধারার ক্ষেত্রেও একই কথা। 'শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্'। গুরুর পদতলে নতজানু হয়ে শিক্ষা নিতে হবে ভক্তিভরে, গুরুদেব ও পাঠ্যবস্তুর উপর একান্ত অনুরাগ রেখে - এইভাবেই সুশিক্ষাসহ জীবনের পরম প্রাপ্তি, অর্থাৎ ঈশ্বর লাভের দিকে এগিয়ে যাওয়া যাবে (শ্রদ্ধা)।

নিয়ম মানার সুফল

একটা প্রচেষ্টার কথা বলে নেওয়া যায় -

আমার বাসায় দুটি কিশোর (সমবয়সী) থাকে। তাদের এই রকম নিয়মানুবর্তিতার মধ্য দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করি। তারা ছ'টার মধ্যে ঘুম থেকে উঠে ব্যায়াম, প্রাণায়াম, গুরুমন্ত্র স্মরণ (এরা দুজনেই দীক্ষিত) করে, শুদ্ধ আহারে দিন শুরু করে। পাঠাভ্যাস ও স্কুল কলেজ সেরে ফিরে সন্ধ্যায় মনঃসংযোগ ব্যায়াম, প্রাণায়াম, জপআহ্নিক সেরে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত পড়াশুনা করে শোয়। নিয়ম মেনে টি.ভিতে খবর শোনে, খেলা দেখে - নিয়ন্ত্রিত সময় ধরে। তাদের ছোটখাটো ভুলভ্রান্তি শুধরে যেমন দিতে থাকি, তেমনি কাছে কাছে থেকে আন্তরিক সাহচর্যও দিতে থাকি। তারা মনের কথা অকপটে আমায় বলে। আমি সব সময়ই গুরু চরণে ভরসা রেখে এগিয়ে যেতে বলি অবিচলভাবে। নবম শ্রেণী থেকে শুরু করে আজ তারা স্নাতকোত্তর ও ইঞ্জিনিয়ারিং এর পড়াশুনায় ব্যস্ত আছে। এই সুশৃঙ্খল আচরণের মধ্যে সুবোধ বালকেরা আজ যৌবনে পা দিয়েছে। এইভাবে তাদের আগেকার থেকে পরীক্ষার ফলাফল, আচার ব্যবহার, মানসিকতা ও সামাজিক সৌজন্যবোধের কম করে পঞ্চাশ শতাংশ পরিবর্তন হয়েছে। তাদের এই সুন্দর জীবন যাপন দেখে পল্লীর লোকেরাও খুব প্রশংসা করে।

চতুরাশ্রমের আসল অর্থ

সহজ করে বলতে গেলে, চতুরাশ্রম আসলে মানব জীবনের চারটি সুচিন্তিত, সুবিন্যস্ত শিক্ষাক্ষেত্র - যাদের প্রতিটির সঙ্গেই প্রতিটির নিবিড় যোগাযোগ আছে। প্রথমটি মানুষের জীবন গঠন কাল, দ্বিতীয়টি মানুষকে জাগতিক বস্তু অর্জনের তথা জীবন যাপনের পথ দেখায়, যাতে করে আত্ম নির্ভরশীল হয়ে সংসার জীবন কাটে ও পরিবারের সকলকে সুখশান্তিতে রাখা যায় এবং একই সময়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গে আন্তরিক হওয়ার চেষ্টা করতে হয়।

ক্রমশঃ

ভগবন্নির্দিষ্ট তিনপথের কথা বলেই পরমগুরুমহারাজ বলেছেন ঃ

"জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি তিনোহী রাস্তা হ্যায়, জিস্‌কো জো রাস্তামে জানেকা সুবিধা পড়তা হ্যায়। তব আখিরমে পহুঁছেগা একহী স্থানমে। জো জিস্ রাস্তামে জায়, জায়েগা এক ঈশ্বরকে পাস্।"

শ্রীরামচন্দ্রের গঙ্গাপার

শ্রীসোমনাথ সরকার

শ্রীমদ্ গোস্বামী তুলসীদাসজী মহারাজ তাঁর বিখ্যাত শ্রীরামচরিতমানস গ্রন্থের অযোধ্যাকাণ্ডে শ্রীরামচন্দ্রের লীলার একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। সুমন্ত্র সারথীকে রথ সহ অযোধ্যার দিকে যাত্রা করিয়ে দিয়ে শ্রীরামচন্দ্র, সীতাদেবী ও লক্ষ্মণ কিছুটা পথ পেরিয়ে গঙ্গাতীরে এসে পৌছলেন। এবার গঙ্গার পরপারে যেতে হবে। গঙ্গারতীরে একটিমাত্র নৌকো বাঁধা রয়েছে। আর তাতে বসে রয়েছে মাঝি। শ্রীরাম তার কাছে এসে মাঝিকে গঙ্গা পার করিয়ে দেবার কথা বললেন। মাঝি তো চুপচাপ বসেই রইলো। কথার কোন উত্তর দিলনা। উঠেও দাঁড়ালো না। শ্রীরাম এবার তাকে অনুরোধ করলেন গঙ্গা পার করিয়ে দেবার জন্য। মাঝি এবার বললো - মহারাজ আপনার খ্যাতি এখানে এসে ইতিমধ্যেই পৌছিয়েছে। আপনার চরণধূলির স্পর্শে পাথর ঋষিপত্নীতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

এখন আপনার চরণধূলির স্পর্শে যদি আমার নৌকা স্ত্রীলোকে পরিণত হয় তো আমি বিপদে পড়ে যাব। একে তো আমার বাপ ঠাকুরদার মত মাঝির বৃত্তি ছাড়া আর কোন কাজ জানা নেই। তার ওপর আমার ঘরে ইতিমধ্যেই আমার স্ত্রী আছে। দ্বিতীয় স্ত্রীলোক এলে ঝঞ্ঝাট বাড়বে। তারপর যদি সে ঋষিপত্নী হয় তো সে আমাদের সঙ্গে থাকতে পারবে না। তাকে আলাদা কুটির করে দিতে হবে। তার ওপর আমার নিজেরই খাবার জোটে না। সে আমাদের খাবার খাবে না। তাকে ফলমূল এনে দিতে হবে।

তাই বলছি যদি আমার নৌকায় পার হতে চান তো আমাকে বলুন আপনার চরণের ধূলি ধুইয়ে দিতে আর যদি না চান তো একটু এগিয়ে যান। কিছু দুরে গঙ্গার জল কম। সেখান দিয়ে সাঁতরে পার হয়ে যান। কিন্তু আমি জানি, আপনি অন্যকে পার করাতে পারেন। নিজে পার হতে পারেন না। শ্রীরামচন্দ্র হাসলেন। বললেন - মাঝি তুমি আমার চরণ ধুইয়ে দাও।

এইবার মাঝি উঠে দাঁড়ালো। গ্রামের দিকে হাঁটা লাগালো। শ্রীরাম বললেন - কোথায় যাচ্ছ? মাঝি বললো - মহারাজ পুণ্য কর্ম একা করতে নেই। নিজের অর্ধাঙ্গীনির সঙ্গে করতে হয়। মাঝি সত্তর গৃহে গিয়ে তার পত্নীকে বলল - শীঘ্র চল। আমাদের জীবনে এক বহু পুণ্য সময় এসেছে ভগবানের চরণ সেবা করার। মাঝি তার পত্নীকে নিয়ে ফিরে এলো, আর একটা ছোটো পাত্র নিয়ে এসে, তাতে পা দিয়ে শ্রীরামচন্দ্রকে দাঁড়াতে বললো। পাত্রটি ছোট। শ্রীরাম বললেন - মাঝি আমি তো পড়ে যাব। মাঝি বললো - মহারাজ আপনি আমার মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়ান। শ্রীরাম মাঝির মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়ালেন। শ্রীলক্ষ্মণ ভাবলেন - এ তো বেশ আছে - চরণ সেবাও করছে, আবার মাথায় হাত দিয়ে আর্শীবাদ ও নিচ্ছে।

চরণ ধুইয়ে দেবার পর মাঝি গ্রামের দিকে ফিরে যেতে লাগল। শ্রীরাম বললেন - আবার কোথায় যাচ্ছ? মাঝি বললো - মহারাজ আগে এই চরণামৃত গ্রামের সবাইকে পান করাই তবে তো যাব। সবাইকে চরণামৃত পান করিয়ে কিছুক্ষণ বাদে মাঝি ফিরে এলে শ্রীরাম বললেন - এবার তো পারে চলো।

মাঝি বলল - দাঁড়ান মহারাজ - আপনার আগে যারা আছে তারা আগে পার হোক। শ্রীরাম বললেন - কৈ আর তো কাউকে দেখতে পাচ্ছিনা। আমরাই তো কেবল আছি। মাঝি বলল - মহারাজ

আপনার আগে আমার তামাম মৃত পূর্বপুরুষেরা আছেন পারে যাবার জন্য। আমাদের গ্রামে কোন পণ্ডিত নেই, তাই তাদের শ্রাদ্ধ হয় নি। আপনি রাজার ছেলে। কিন্তু আমি জানি বশিষ্টদেব আপনাকে বৈদিক মন্ত্র শিখিয়েছেন। যদি আপনি আমার পিতৃপুরুষদের পারলৌকিক কার্য করে দেন তো ভালো হয়। শ্রীরাম আর কি করেন! তিনি আচার্য হলেন, আর লক্ষ্মণ উপাচার্য। শ্রাদ্ধের কার্য সম্পন্ন হল। শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতাদেবী নৌকোয় উঠে বসলেন। মাঝি নৌকা ছেড়ে দিল। নৌকাটা যখন পরপারের কাছাকাছি পৌঁছেছে মাঝি হঠাৎ নৌকো পারে না ভিড়িয়ে নৌকো ঘুরিয়ে নিয়ে চলল। শ্রীরাম ভাবলেন - মাঝি বোধ হয় কিছু ভুলে গেছে। মাঝি আগের পাড়ের কাছাকাছি নিয়ে এসে পাড়ে না ভিড়িয়ে ফের নৌকা ঘুরিয়ে দিল।

এইভাবে নৌকো পাড়ে না ভিড়িয়ে মাঝি বার বার এপার ওপার করতে লাগল। শ্রীরাম বললেন - মাঝি তুমি এটা কি করছ? আমরা ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছি। মাঝি বলল - মহারাজ আপনি আমাদের চুরাশি লাখ বার ঘোরানোর সময় ক্লান্ত হন না। আর নিজে এত অল্পে ক্লান্ত হয়ে গেলেন? শ্রীরামচন্দ্র বললেন - মাঝি আমাদের দেরী হয়ে যাচ্ছে। মাঝি বললো মহারাজ - মাতা কৈকেয়ী কি আপনাদের কোনো দিনক্ষণ বলে দিয়েছেন যে এই তিথিতে এখানে থাকতে হবে, ওই তিথিতে ওখানে থাকতে হবে? তা হলে এত তাড়া কিসের? এখানে এক সপ্তাহ থেকে যান, পরে এখান থেকে চলে যাবেন।

অবশেষে মাঝি পাড়ে নৌকা ভেড়ালো। শ্রীরামচন্দ্র নেমে এলেন নৌকো থেকে। মাঝি তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়লো। শ্রীরামচন্দ্র ভাবলেন একে তো কিছু দেওয়া উচিত। এ যখন কাউকে পারে নিয়ে আসে তখন লোকে একে কিছু পারাণি দেয়। কিন্তু এখন তো আমার কাছে কোনো পারাণি নেই। সীতাদেবী রামের মনের কথা বুঝতে পারলেন। সীতাদেবীর হাতে শ্রীরামের আংটি ছিল। তিনি সেটা শ্রীরামের হাতে দিলেন।

শ্রীরাম সেই আংটি মাঝিকে দিতে গেলেন। মাঝি কাঁদতে লাগল। সে বলল মহারাজ আজ আমি কি পাইনি? আমি চিরজীবনের জন্য ধন্য হয়ে গেছি। আর আমার অতিরিক্ত কি চাই? আর তা ছাড়া আমি আপনি একই পেশার লোক। একই পেশার লোকের থেকে পারিশ্রমিক নিতে নেই।

আমি এই নদী পার করাই আর আপনি ভবসাগর পার করান। তাই আপনার কাছে আমার এই মিনতি - আমি যখন মারা যাব, তখন আপনি আমাকে এই ভবসাগর পার করিয়ে দেবেন। বলে মাঝি আবার শ্রীরামচন্দ্রকে প্রণাম করার পর শ্রীরাম ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

আমরাও আমাদের ভবপারাপারের কাণ্ডারী শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের উদ্দেশ্যে এই প্রার্থনা জানাই যে আমাদের অন্তিম সময়ে তিনি যেন আমাদের হাত ধরে ভবপারাপার করিয়ে দেন।

"ভবসমুদ্র সুখদনাভ ইক রাম নাম, ইক রাম নাম ....." গুরুদেব আমাদের শিখিয়েছেন।

প্রাতঃস্মরণীয়

শ্রীমতী কস্তুরী রায়

গুরুমহারাজজীর সংস্পর্শে আসা অসংখ্য ভক্তশিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে কেউ কেউ নিজ চরিত্রের অনন্যতার পরিচয় রেখে গেছেন - শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁদের স্মরণ করি।

ভাগলপুরের সরকারী কলেজের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক শ্রী ছবি বসু - সকলের মুখে ছবিদা বলে পরিচিত সস্ত্রীক গুরুদেবের শিষ্য ছিলেন। গুরুদেব ভাগলপুরে যে গৃহে অবস্থান করতেন সে সুবাদে অনেক শিষ্যভক্ত অতিথি হয়ে আসতেন। গৃহস্বামী এতজনের ব্যবস্থা করতে অসমর্থ হলে ছবিদা স্বগৃহে তাঁদের পরম আদরে নিয়ে যেতেন, সাধ্যমত। স্বল্পভাষী, সুদর্শন, আত্মপ্রচার বিমুখ ছবিদা দেওঘর আশ্রমে উৎসব উপলক্ষে গেলে দূর থেকে গুরুদেব ও পূজা যজ্ঞ দর্শন করতেন। দৈবাৎ গুরুদেবের সামনাসামনি পড়ে গেলে, গুরুদেব খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতেন, "কখন এলে? কোথায় উঠেছ, সেখানে কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা, যথাসময়ে ভাণ্ডারা প্রসাদ নিচ্ছ কিনা" - সব অতিথিদের প্রতিই গুরুদেব এইরকম খোঁজখবর স্বয়ং নিতেন; আমাদেরও যখন জিজ্ঞেস করতেন ভাবতাম আমি কি যে সে।। গুরুদেব আমাকে কত স্নেহ করেন। "মনে গরব সোহাগ না ধরে" - অথচ ছবিদা বিব্রতভাবে সংক্ষেপে মাথা নেড়ে বা হাতের ইশারায় জানাতেন সব ঠিক আছে - তারপর দ্রুত স্থানান্তরে পালাতেন। বলতেন -"এতবড় যজ্ঞ, এতবড় পূজা উৎসব, কত দায়িত্ব, কত কাজ ওঁনার। প্রতিদিন শতসহস্র অতিথি আসছেন, সকলকে যদি একটিমাত্র কথা জিজ্ঞেস করেন, প্রত্যেকদিন বাড়তি কতগুলো কথা ওঁকে বলতে হবে। শিষ্য হিসাবে একটু সংযম ও ত্যাগের দ্বারা ওঁকে এই কষ্ট থেকে রেহাই কি দিতে পারি না? উনি কী এটুকু সহযোগিতা আমাদের কাছ থেকে পেতে পারেন না?"

আর একজনকে মনে পড়ে ভাগলপুরেরই বাসিন্দা - শ্রী প্রভাত সেন। অত্যন্ত সাধারণ বেশভূষা, বিনীত ব্যবহার, মিতভাষী, সর্বদা আত্মমগ্ন, প্রসন্ন চিত্ত। তাঁর ভেতরে এক অসাধারণ ভক্ত আত্মগোপন করেছিল।

একবার দোলের সময় গুরুদেব দোতলা থেকে নেমে যজ্ঞমণ্ডপে যাচ্ছেন হঠাৎ প্রভাতদাকে দেখে পার্শ্বস্থ একজনকে নির্দেশ দিলেন গোপনে। তিনি তৎক্ষণাৎ দোতলা থেকে মস্ত বড় পিতলের রংভরা পিচকিরি নিয়ে এলেন। কুশল জিজ্ঞেস করতে করতেই হঠাৎ গুরুদেব এক পিচকারি লাল রঙে প্রভাতদার আপাদমস্তক ভিজিয়ে দিতেই প্রভাতদা ঘটনার আকস্মিকতায় বাঁ হাত ঢালের মত বাড়িয়েও "এই কী হচ্ছে কী হচ্ছে" বলে কৃত্রিম বিরক্তিতে লাফাতে লাগলেন; গুরুদেব খিল খিল করে হাসতে লাগলেন - প্রভাতদার তন্ময় গুরুভক্তি যেন ব্রজসখাদের ভাবের আমেজ মাখা।

শুনেছি গুরুদেবের আরতি ইনিই প্রথম শুরু করেন। পরবর্তীকালে অনেকে সাহস করে সেসব অনুসরণ করেছেন।

কল্পনায় দেখি গুরুচরণপ্রান্তে প্রেমে ভক্তিতে বিনত প্রভাতদার জ্বলন্ত পঞ্চপ্রদীপের উদ্ভাসে স্বতঃ, উজ্জ্বল, শ্রীগুরুদেবের মুখখানি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে আনন্দে ভক্তভাবে গ্রহণকারী ভগবান যেন প্রসন্ন হয়ে সে পূজা গ্রহণ করছেন -

"মিলনের ধারা পড়িছে ঝরি, বহিয়া চলেছে অমৃতলহরী, ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে নিজেরে নিবেদন"-

অথ রামায়ণী কথা

অন্ধমুনির শাপ

শ্রীমতী অনসূয়া ভৌমিক

শ্রীশ্রী বালেশ্বরী পত্রিকাতেএর আগে আরও দুটি শাপের কথা লিখেছিলাম। প্রথমটি নারায়ণ ও লক্ষ্মী কিভাবে ভার্গব ও ধরিত্রীর শাপে ধরায় জন্ম নিলেন, দ্বিতীয়টি রাবণের কথা। প্রভূত বলবীর্যশালী এবং অনেক গুণসম্পন্ন হয়েও নিজের কৃতকর্মের জন্যে কীভাবে তিনি শাপগ্রস্ত হয়ে সবংশে বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

এবার আসি আর একটি শাপের প্রসঙ্গে। এখানে রাজা দশরথ কীভাবে তাঁর কৃতকর্মের ফল ভোগ করেছিলেন সেটাই দেখানো হয়েছে।

আদিকবি বাল্মীকি তাঁর মহাকাব্য রচনা করার সময়ে পরাত পরাত চমক ঢুকিয়ে পাঠকের কৌতূহল ধরে রাখতে চেয়েছেন। এরকম এক চমকই হোল অন্ধমুনির গল্প।

রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে আমরা দেখি রামকে বনবাসে পাঠিয়ে রাজা দশরথ অত্যন্ত শোককাতর। তাঁর মনে নানারকম কথার আনাগোনা - অনেক পুরনো কথা মনে এসে ভীড় করছে, এরই মাঝে পুত্রশোকাকুলা কৌশল্যাকে তিনি এই কথা বলেন। বললেন, ভালো-মন্দ যাই করা হোক না কেন কর্তাকে তার ফল ভোগ করতেই হয়। বছর বছর আগে যখন আমি বিবাহ করিনি, সেই সময়ে যৌবনকালে আমি একদিন মৃগয়া করতে বেরিয়েছিলাম। সময়টা ছিল বর্ষাকাল, চারিদিকে অতি মনোরম পরিবেশ, সন্ধ্যাবেলা রথে চড়ে ধনুর্বাণ নিয়ে চলে এলাম সরযূনদীর দিকে। নদীতে অনেক পশু আসে জলপান করতে, শব্দভেদী বাণের সাহায্যে অনায়াসেই কোন পশু শিকার করতে পারব। যেতে যেতে ঘোর অন্ধকার নেমে এল, সেই অন্ধকারে আমি কলসীতে জল ভরার মত একটি আওয়াজ পেলাম। শব্দ শুনে মনে হল কোনো হাতি যেন আওয়াজ করছে এবং এই অনুমান করে আমি বিষধর সাপের মত একটি শর লক্ষ্যের দিকে নিক্ষেপ করলাম। সেটি ছিল শব্দভেদী বাণ। অনতিপরেই ভেসে এল এক বালকের কাতর আর্তনাদ। আমি তাড়াতাড়ি করে সেখানে পৌঁছে দেখলাম শরবিদ্ধ এক তাপস বালক যন্ত্রণায় ছটপট করছে, আর কাছেই একটি কলসী গড়াগড়ি খাচ্ছে। আমাকে দেখে যন্ত্রণাক্লিষ্ট সেই বালক হাহাকার করে উঠলো। "এই রাতে অন্ধ পিতা-মাতার জন্য জল নিতে এসে একী অঘটন ঘটলো! বন্য ফলমূল কন্দ দিয়ে বনবাসী আমরা জীবন ধারণ করি, তবে কেন আমার এ দশা হলো? আপনার একটি বাণ শুধু আমার প্রাণ হরণ করল না, সঙ্গে সঙ্গে দুটি অন্ধ বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকেও বধ করল। তাঁরা অত্যন্ত পিপাসিত ও আমার প্রতীক্ষারত। আপনি যত শীঘ্র সম্ভব তাঁদের কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বলুন। সামনের ছোট পথ দিয়েই আশ্রম যাওয়া যায়। সেখানে গিয়ে আপনি তাঁদের প্রসন্ন করুন, যাতে তাঁরা আপনাকে কোনো অভিশাপ না দেন আর আমার মর্মস্থান থেকে এই তীক্ষ্ণশর উদ্ধার করে আমাকে শল্যহীন করুন, এটি আমার মর্মে বড়ই আঘাত করছে।" এই কথা শুনে আমি চিন্তায় পরে গেলাম, শরমোচন করলেই তো বালকের প্রাণ বিসর্জন হবে এবং আমাকে ব্রহ্মহত্যার

পাপে পাতকী হতে হবে। আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে বালক বল্ল, " আমি দ্বিজাতি নই, আমার পিতা বৈশ্য ও মাতা শূদ্রাণী।" এইকথা শুনে আমি অতিযত্নে তার বক্ষ থেকে শল্য উদ্ধার করলাম। এরপরই বালকটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বিলাপ করতে করতে সরযূ নদীর তীরে প্রাণ ত্যাগ করলো। আমি কিছুক্ষণ চিন্তা করে জলপূর্ণ ঘট নিয়ে বালকের দেখিয়ে দেওয়া পথে আশ্রমে গেলাম, সেখানে তৃষ্ণার্ত বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে দেখে আমার শোক আরও বেড়ে গেল। এদিকে পায়ের শব্দশুনে ঋষি বলতে লাগলেন, 'আজ এত বিলম্ব কেন? শীঘ্র করি প্রদান কর, তুমি আমাদের গতি ও চক্ষু আমরা তোমাকে অবলম্বন করেই বেঁচে আছি, তুমি কেন কোন কথা বলছ না?' আমি তখন অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে সব কথা নিবেদন করলাম। হঠাৎ এইরকম নিদারুণ কথা শুনে তাঁরা আমাকে শাপও দিতে পারলেন না, বরং তাঁদের সন্তানকে একবার শেষ দেখা দেখতে চাইলেন। আমি পুত্রশোকাতুর দম্পতিকে সেই স্থানে নিয়ে গেলাম এবং দেখতে পান না বলে পুত্রের অঙ্গস্পর্শ করিয়ে দিলাম, পুত্রের শরীরে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে তাঁরা নানা কথা বিলাপ করতে লাগলেন। এভাবে বার বার বিলাপ করতে করতে তাঁরা সন্তানের পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম করতে উদ্যোগ নিলেন।

এই সময় ঋষিকুমার নিজ সুকর্মবলে দিব্যরূপ ধারণ করে ইন্দ্রের সঙ্গে স্বর্গারোহণ করলেন এবং যাওয়ার সময় পিতামাতাকে এইবলে আশ্বাস দিয়ে গেলেন যে, অচিরেই তাঁরাও স্বর্গলাভ করবেন।

এইবার পরম তেজস্বী অন্ধমুনি তাঁর ভার্যার সঙ্গে পুত্রের তর্পণ করে বল্লেন, "একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে আমরা এখন অপুত্রক। আমাদের বেঁচে থাকাও নিরর্থক। অজ্ঞানবশতঃ হলেও আমার বালকপুত্রের প্রাণহরণ করার জন্য তোমাকেও এক দুর্বিষহ অভিশাপ পেতে হবে। আমরা যেমন পুত্রের মৃত্যুজনিত অনেক দুঃখ-ক্লেশ ভোগ করছি তুমিও তেমন পুত্রশোকে কষ্ট পেয়ে মৃত্যুবরণ করবে। তুমি না জেনেই হত্যা করেছ বলে ব্রহ্মহত্যার পাতক হবে না কিন্তু নিদারুণ পুত্রশোক তুমি অবশ্যই ভোগ করবে। এরকমভাবে শাপ দিয়ে করুণস্বরে অনেক বিলাপ করতে করতে তাঁরা চিতায় আরোহণ করে স্বর্গারোহণ করলেন।"

এই পর্যন্ত বলে দশরথ বল্লেন, "এখন সেই সময় উপস্থিত হয়েছে। অজ্ঞানতা বশতঃ যে কাজ আমি করেছিলাম, তা এখন আমার মনে পড়ছে।" এইরকম বিলাপ করতে করতে রাজার সংজ্ঞা লোপ পেল, এভাবেই রাজা দশরথের অন্তিম সময়ে অন্ধমুনির শাপ ফলে গিয়েছিল।

"প্রাণবায়ু হস্তগত হোনে সে তব্ প্রাণায়াম প্রতিষ্ঠিত হোগা।" প্রাণকে এইভাবে হস্তগত ক'রে এগিয়ে যেতে হয় মনের দিকে, যা প্রাণের চেয়েও সূক্ষ্ম, ধরে-ছুঁয়ে যাকে পাওয়া যায়না। স্থূল থেকে ক্রমশঃ সূক্ষ্মে এইভাবে সাধনকে তুলতে হয়। প্রাণের সঙ্গে মনের এক অচ্ছেদ্য সম্পর্ক, ঋষিরা আবিষ্কার করেছিলেন। তাই তাঁরা জানিয়ে গিয়েছেনঃ

"চলে বাতে চলচ্চিত্তং নিশ্চলে নিশ্চলং ভবেৎ।"

পরমগুরুমহারাজ

পুণ্য পরশ পুলক

শ্রী বসুমিত্র মজুমদার (৬ষ্ঠ পর্ব)

গুরুমহারাজ ধানবাদের বাড়িতে এলে, আমার বিশেষ দায়িত্ব থাকতো ভাঁড়ার ঘরে। অসংখ্য ভক্ত শিষ্য আসছেন, গুরু প্রণামান্তে তাঁদের লাড্ডু দেওয়া হত, যাঁরা আসছেন, তাঁদের সবার জন্যই দু বেলা ভাণ্ডারার ব্যবস্থা থাকতো। দু বেলা কীর্তনের শেষে হরিলুট দেওয়ার জন্যেও লাড্ডু লাগত। সেই জন্যে চাল, ডাল, আটা, আলু, তেল, মশলা, চিনি, লাড্ডু সমস্তই থাকত ভাঁড়ারে। প্রয়োজন মতো ভাঁড়ার থেকে জিনিসপত্র বার করে দিয়ে ঘরে চাবি লাগিয়ে দিতাম।

আমি তখন ক্লাস সেভেন কি এইটে পড়ি। সেবারে মাত্র দু'নৌকা লাড্ডু এসেছে। অথচ আগের বার ছ নৌকা লাড্ডু লেগেছিল। এবারে চার নৌকা কম। এদিকে লোক আসছে তো আসছেই, আসছে তো আসছেই। প্রথম দিনেই এক নৌকা শেষ। আর একটা মাত্র নৌকা বাকি। সে কথা গৃহকর্ত্রীকেও জানালাম। কিছুই উত্তর পেলাম না। অগত্যা, 'যখন শেষ হবে, তখন দেখা যাবে', এই ভেবে, যেমন যেমন নিতে আসছে সেই মতো নৌকা থেকে বালতি ভরে লাড্ডু তুলে দিচ্ছি। দিয়েই যাচ্ছি, দিয়েই যাচ্ছি আর ভাবছি এই নৌকা শেষ হয়ে গেলে তখন কী হবে।

কোথা দিয়ে তিন তিনটে দিন কেটে গেল। মহারাজের এ বাড়ি থেকে বিদায় নেবার সময় এলো। তিনি চলে গেলেন। তিন দিনের লোকারণ্য-বাড়িতে পড়ে রইলাম আমরা পাঁচ ছজন মাত্র। উৎসবের আলো নিবে গিয়ে হঠাৎ ভীষণ ঘন অন্ধকার ঘনিয়ে এল মনের আনাচে কানাচে। ফুরিয়ে যাওয়া আতঙ্কে এই তিন দিন একটা লাড্ডুও খাইনি। মন খারাপের সময় মনে হল যাই এবার একটা লাড্ডু খাই।

ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে দেখি ওমা! একী! নৌকার গায়ে লাড্ডুর একটা কণাও নেই। পুরো যেন লেপে পুঁছে পরিস্কার করে দেওয়া। ফ্রিজেও নেই। অন্য কোথাও নেই। খুব অবাক হলাম। এটা কী হল। বাবা বললেন, 'এটা গুরুমহারাজের লীলা'।

এর পরে প্রায় বিশ পঁচিশ বছর কেটে গেছে। সেবারে কোলকাতায় ছোটমাসী ও মেসোমশাই নতুন ফ্ল্যাট কিনেছেন। তারই গৃহপ্রবেশ হবে। তাঁদের ইচ্ছে স্বয়ং নারায়ণ এসে সে বাড়ি উদ্বোধন করুন। সেই মানসে মহারাজের আশীর্বাদ চাইতে গেলে, তিনি নতুন ফ্ল্যাটে আসতে সম্মত হলেন। কিন্তু বিশেষ বিশেষ লোক ছাড়া আর কাউকেই সেই সংবাদ দেওয়া যাবে না। এই অঙ্গীকার গুরুমহারাজের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা কমিটির কাছে করে রাখতে হল।

এটা যে সময়ের ঘটনা, সে সময় ভক্তজনের ভিড় এড়িয়ে চলার পালা চলছিল। সেই পর্যায়ের নাম দেওয়া হয়েছিল, 'অজ্ঞাতবাস'। অর্থাৎ গুরুমহারাজ কোথায় কখন অবস্থান করছেন সেটা সে সময় বিজ্ঞাপিত হত না।

সে গৃহপ্রবেশেও এক মজার ব্যাপার। ঠিক হল যে, গুরুমহারাজ ফ্ল্যাটে প্রবেশ করার সময় আগে শান্তিজল ছিটিয়ে দেবেন, আগে তিনি প্রবেশ করবেন। তাঁর পিছন পিছন ফ্ল্যাটকর্তা, ফ্ল্যাটকর্ত্রী, অতঃপর জনসাধারণ প্রবেশ করবেন।

একটা বড় বাটিতে চন্দন, অগরু ও রকমারি সেন্ট মিশিয়ে শান্তিজল প্রস্তুত করা হল। তার ওপর গোলাপ ফুলের পাপড়ি ফেলা হল। তখনকার মতো সেই বাটি রেখে দেওয়া হল গুরুমহারাজ এসে যে আসনে বসবেন, তার নিচে। যথাসময়ে সেই বাটি নিয়ে একজন দরজার সামনে থাকবেন। গুরুমহারাজ এসে ওই বাটির জল ছিটিয়ে প্রবেশ করবেন। এই ছিল পরিকল্পনা।

যথাসময়ে গুরুমহারাজ এলেন। তাঁকে স্বাগত জানাতে আমরা সবাই মিলে হুড়মুড় করে নিচে নেমে গেলাম। লোকজন কম, তাই মহারাজের বাক্সগুলো গাড়ি থেকে নিয়ে আসার জন্যে আমাদের ওপর আদেশ দিলেন গৃহকর্ত্রী। আমরাও সকলে মিলে বাক্সগুলো গাড়ি থেকে নামিয়ে গুরুমহারাজের জন্যে নির্দিষ্ট করা ঘরে রাখতে লাগলাম।

সেই কাজ সারা হলে গুরুমহারাজকে প্রণাম করার সময় দেখলাম আমাদের পরিকল্পিত শান্তিজল তখনও অস্পর্শিত অবস্থায় গুরুমহারাজের বসার আসনের নিচেই রয়ে গেছে।

সারাদিন হৈ হৈ করে কেটে গেল। সন্ধ্যার সময় ভ্রমণ সেরে এসে গুরুমহারাজ বসলেন আগত ভক্তদের প্রণাম নিতে। তখন প্রায় রাত নটা বাজে। ঘরে সে সময় জনা কুড়ি ভক্ত উপস্থিত। গুরুমহারাজ গৃহকর্ত্রীকে বললেন, 'যারা আছে, তারা যেন এখানে খেয়ে যায়।'

এটা ধানবাদের বাড়ি নয়। সে বাড়িতে প্রতিদিন এক এক বেলায় গুরুমহারাজের কৃপায় পাঁচশো সাতশো ভক্তের ভাণ্ডারা থাকত। এখানে একে তো ছোট ফ্ল্যাট, তার ওপর আগাম কোন পরিকল্পনা নেই। গৃকর্ত্রীর তো মাথায় হাত। তিনি গুরুমহারাজের কাছে গিয়ে বললেন, 'এই রাতে এতজনকে কী খাওয়াবো'? গুরুমহারাজ প্রণত ভক্তের গলায় মালা পরিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'রুটি তরকারি।'

উপস্থিত কোন একজন পরামর্শ দিলেন, 'রুটি দোকান থেকে কিনে আনুন। ঘরে এতজনের রুটি এখুনি তো করা যাবে না। এখানে রুটির সঙ্গে তরকারি দিয়েই দেয়।'

এবারে আমাদের বিপদে পড়ার পালা। এই শীতের রাতে অচেনা জায়গায় কে যাবে রুটি কিনতে? দাদারা সবাই একে একে আমাকে দেখিয়ে দিলেন। গৃহকর্ত্রী বললেন 'মোট বিয়াল্লিশটা রুটি লাগবে। এই নে একশো টাকা রাখ। তাড়াতাড়ি নিয়ে আয়।'

অগত্যা বেরিয়ে পড়লাম। এখনকার গল্ফগ্রীণের সঙ্গে সেদিনের গল্ফগ্রীণের তুলনা করা যাবে না। তখন সেখানে রাস্তার ওপর কেবল এবড়ো খেবড়ো খোয়া ফেলা। দূরে দূরে পোস্টে আলো জ্বলছে টিমটিম করে। এপাশে ওপাশে পুকুর। চারিদিকে ফাঁকা। হু হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। তার মধ্যে চলেছি অচেনা রাস্তা দিয়ে ভক্তদের জন্যে রুটি আনতে। সামনেই একটা দোকান ছিল। সেখানে জিজ্ঞাসা করলাম, 'রুটি হবে?' দোকানি বললেন, 'কটা দেব?' বললাম, 'বিয়াল্লিশটা।' শুনলাম, 'না, সাতটা আছে।'

আরও খানিকটা এগিয়ে আর একটা দোকান পেলাম। শুনলাম, 'পাঁচটা আছে'। এই ভাবে তিন চারটে দোকান ঘোরার পর একটা দোকান বললেন, 'এই রাতে আপনি অত রুটি একসঙ্গে পাবেন না। যেখানে যেমন পাচ্ছেন নিয়ে নিন।' কথা শুনে হতাশ হয়ে থমকে দাঁড়ালাম। কিন্তু পরক্ষণেই মনে

শেষাংশ ৫১ পৃষ্ঠায়

'সংস্কার'

শ্রীমতী রীণা মুখোপাধ্যায়

শুভ সংস্কার এবং কুসংস্কার নিয়ে পৃথিবীর কোন না কোন প্রান্তে প্রায়শই তর্ক-বিতর্ক লেগেই থাকে। কোনটা 'সু' আর কোনটা 'কু' - তা বুঝতে বুঝতেই মানুষ জীবনের শেষ প্রান্তে চলে যায়। পরীক্ষার ফলাফলে, খেলার মাঠে উত্তেজনা মুহূর্তে, জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের কঠিন সময়ে, সুসময়ে, দুঃসময়ে আমাদের অজান্তেই প্রতিনিয়ত সংস্কার মনে এসেই যায়। এই নিয়ে কেউ বেশিরকম সংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আমরা তাই নিয়ে যতই হাসাহাসি করে অপরের চোখে নিজেকে স্মার্ট প্রতিপন্ন করতে চাই না কেন, কোনো না কোনো সংকট মুহূর্তে আমরা এই সংস্কারের জালে জড়িয়ে পড়তে স্বেচ্ছায় বাধ্য হই। ঘোর বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য মনে সংস্কার আসতে বাধ্য।

২০২০-র ৫ই এপ্রিল সারা দেশে রাত নটা বেজে ন মিনিটে ঘরে ঘরে জ্বলে উঠেছিল প্রদীপ, মোমবাতি। এবার চমৎকারিত্বের কথায় আসি। প্রদীপ মোমবাতি জ্বালানোর পরমুহূর্তেই আমার পাশের ফ্ল্যাটের বৌদি হন্তদন্ত হয়ে এসেই বলল, একটা আশ্চর্য্য জিনিস দেখবে এস। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে আমরা সবাই বলে উঠলাম - কী হয়েছে? কোনো কিছু শোনার আগেই পাশের ফ্ল্যাটের দাদা অর্থাৎ বৌদির স্বামী সে বলল - নোড়াটা পড়ে গেছে। আমরা হতভম্বের মতো চেয়ে রইলাম। আসল ব্যাপার হল - এই প্রদীপ-মোমবাতি জ্বালানোর পরে শিলের ওপর নোড়া দাঁড় করালেই নোড়া দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল। সাধারণত শিলের ওপর নোড়া দাঁড় করানো যায় না। আর তাতেই প্রমাণ একটা নির্দিষ্ট সময়ে চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরী হয়েছে। পূর্বেই নাকি জানা গিয়েছিল ওই সময় চৌম্বক শক্তি উৎপন্ন হবে। বাড়িতে বাড়িতে এই শিলনোড়া নিরীক্ষার ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়। এবার আসল মজাটা হল - আমি সমস্ত কথাটা শুনে বললাম, আমি এখনই শিলের ওপর নোড়াটা দাঁড় করাবো। কিন্তু আমাদের বাড়ীর শিলটা বহুদিন অব্যবহৃত অবস্থায় স্থবির হয়ে রয়েছে - আকারে বড় এবং খুবই ভারী। এই মুহূর্তে তাকে ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে হলে সময় সাপেক্ষ। তাই আমি ফ্ল্যাটের বৌদিকে বললাম, তোমার শিলনোড়া আমাদের ঘরে নিয়ে এসে এখনই পরীক্ষা করে দেখতে চাই। কারণ রটনা ছিল - মোমবাতি জ্বালানোর মুহূর্তটাই ছিল শুভযোগ।

এখন রাত সাড়ে দশটা বেজে গেছে, অনেকটা সময় চলে গেছে। তাই, আর দেরী না করে প্রস্তুত হতে লাগলাম। সমস্তটাই শুদ্ধাচারে করতে হবে - দৈব কর্মকাণ্ডে শুদ্ধাচার অবশ্য কর্তব্য। আমি নিজেকে যতটা সম্ভব শুদ্ধাচারে প্রস্তুত করে শিলের ওপর নোড়া দাঁড় করাবার চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু নোড়াটা ছেড়ে দিলেই হেলে পড়ছে। পাশ থেকে বৌদি আমাকে বলল - ভগবানকে স্মরণ করো। আমি ধূপ হাতে নিয়ে গুরুদেব ইষ্টদেবকে স্মরণ করার কয়েক মুহূর্ত পরেই হাতটা নোড়া থেকে আলগা করতেই দেখলাম, নোড়াটা শিলের মাঝখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমরা সবাই বিস্মিত, অভিভূত। ফ্ল্যাটের দাদা বলল, ও এক্ষুনিই পড়ে যাবে। বলা-বাহুল্য, কিছুক্ষণ আগে এই দাদা নিজের হাতে তার ঘরে এই নোড়াকেই শিলের ওপর দাঁড় করিয়েছিল। আমাদের ডেকে দেখাবার আগেই নোড়া হেলে যায়। দাদা বলল, চুম্বকের মতো নোড়াটা শিলে আটকে ছিল। যাই হোক, নোড়াকে শিলের ওপর আটকে থাকতে দেখে, আমি বললাম, যেমন আছে থাক। বৌদি বলল, রাত্রিরে যদি পড়ে যায় তাহলে

জোর শব্দে সবাইয়ের ঘুম ভেঙে যাবে। আমি তবুও বললাম, দেখি না কি হয়, যেমন আছে থাক। দাদা-বৌদি তাদের ফ্ল্যাটে চলে গেল। শোবার আগে আমরা দেখলাম নোড়া স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

পরের দিন সকালেই পাশের বৌদি আমায় বলল, কখোন পড়লো? আমি বললাম, পড়েনি তো। সেই রকমই আছে। সবাই দেখলাম একদম স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই ঘটনায় বাস্তবিক আমরা সবাই হতবাক্। আমি ভাবলাম - দেখাই যাক্ - শেষ পর্য্যন্ত কী হয়? শুধু রবিবারের সেই রাতটাই নয়, এরকম ভাবে পর পর কয়েকটা দিন কেটে গেল। সেই রকমই নোড়া শিলের মাঝে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সপ্তাহের শেষ দিকে শুক্রবারে বৌদি এসে শিলটা চাইল রান্নার প্রয়োজনে। যদিও তখনই দেবার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু বাধ্য হয়ে দিতেই হল। তাই শেষটা আর দেখা হলো না। বিমর্ষ মনে নোড়াটা তুলতে গিয়ে দেখি শিলের সঙ্গে বেশ আটকে আছে, ঠিক যেমন চুম্বক টেনে রাখে। একটু টানতেই নোড়াটা হাতে উঠে এল। পরিষ্কার শিল, নোড়ার তলাটাও পরিষ্কার। এর থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, ওই সময়ে একটা চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। এক্ষেত্রে আমার একটাই প্রশ্ন - সে সময়ে চৌম্বক শক্তি উৎপন্ন হয়ে শিলের নোড়াকে আটকে রেখেছিল সেটা চার/পাঁচ দিন আগে। ওই সময়ে চুম্বকে টেনে রাখলেও, আমার জানা সবারই নোড়া পড়ে যায়। তাহলে আমার এই নোড়াটাকে সেই রবিবারের রাত থেকে প্রায় পাঁচদিন পর্য্যন্ত চুম্বক টেনে রাখল কী করে? সবার ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য হলনা কেন? তা - ও, আমি যদি নোড়াটা টেনে না তুলতাম তাহলে সেটা কতদিন পর্য্যন্ত ওই অবস্থায় থাকতো তা জানা গেল না। এক কথায় একে অনেকে কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দিলেও - এখানে দৈবকৃপা না বিজ্ঞান, কোন্‌টা জোর তরফে কাজ করল তা সঠিক বোঝা গেল না।

শ্রীশ্রীগুরু চরণে অন্তরের অনন্ত প্রণাম জানাই প্রতি মুহূর্তে, প্রতিক্ষণে। শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজী কী জয়।

মহিমা তোমার

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের কথা লিখতে গেলে পাতার পর পাতা শেষ হয়ে গেলেও মনে হবে বুঝি কিছুই লেখা হোলনা।

আজ একটা ছোট্ট ঘটনা মনে পড়ছে না লিখে পারছিনা। আমি একদিন গুরুমহারাজ এর আমাদের আঠারো বাড়িতে এক উৎসবে থাকাকালীন আমার কর্তাকে বলেছিলাম কত লোক গুরুমহারাজজীকে কত উপহার দিচ্ছে, তুমি আজ কোর্ট থেকে ফেরার পথে একটা কিছু কিনে এনো, আমি দেব। ওমা- দেখি সে হাতে করে একটা বাস্কেট ব্যাগ কিনে এনেছে। আমি লজ্জায় গুরুর হাতে দিতে পারলাম না, সব উপহারের সঙ্গে ঘরের এক কোণায় রেখে দিলাম।

রাত্রে প্রণাম-কীর্তনের পর গুরুদেব ঘরে ঢুকে ভলেন্টিয়ারদের আদেশ করছেন কোনটা কোথায় যাবে। কোনওটা হাসপাতালে বা আশ্রমে বা অন্য কোনওখানে। তারপর ওনার চোখে পড়ল গোলাপী বাস্কেট ব্যাগ। হাতে নিয়ে বললেন, "চমৎকার ব্যাগতো। কোনও চামড়ার লেশ নেই, ভিতরে আবার লাইনিং দেওয়া, খুব কাজে লাগবে, আমি এইটা ব্যবহার করব। আমার ঠাকুর এই ব্যাগে করে ঘুরবে।" আমার প্রাণটা ভরে গেল। আহা কী করুণা তাঁর। *শ্রীমতী সুচন্দ্রা রায়চৌধুরী*

God I have seen without knowing

Sri Aniruddha Ray

It was summer in Benaras. Most parts of Northern India are fairly known for heatwave. The usual office work started at 9-30 A.M. Around noon, the Branch Manager called me in his chamber and handed me a hurriedly scribbled handnote. My aunt sent it to me through a messenger with the information of Guru Maharaj's stay at Shibala Ashram. She reiterated that I should make time in the afternoon after office hour and reach there.

I was awestruck at the mere prospect that I would have darshan of Maharaj. Coming back to my work-table, I shivered a bit at the anticipation of divine association waiting for me a few hours later ! I collected myself and informed my roommate that I would reach home late.

When I reached Shibala Ashram, I found no one around. I strode past quickly through rooms and corridors when a gentleman pointed the way down towards the Ghat where the big boat with Maharaj and other devotees was about to sail. I started running down. The rope anchor was about to unfasten when aunt shouted at the Boatman to let me board in. I jumped into the boat gleefully and saw Gurudev looking at me with his benevolent smile. I bowed graciously in silence. The big boat swayed and started sailling smoothly on the sacred Ganges.

I moved cautiously to reach near my aunt sat down there. Kirtan recital began by devotees. Cool breeze began to blow. The boat moved past numerous ghats one after another. Soon Maharaj began kirtan and the change in atmosphere could easily be deciphered. An inexplicable joy stirred the atmosphere. I pondered how Maharaj bestowed his blessings on all of us every moment. I for one would have spent the evening on other days after office at Dasaswamedh Ghat with friends. But Gurudev had so kindly allowed me to savour celestial moments in his presence.

Meanwhile daylight ended into twilight and Gurudev's kirtan recital filled the air around. I startling revelation dawned on me! How blessed we are who happened to have close proximity of God himself! It is scripted that not a single leaf shivers nor a tiny petal of a flower blushes without God's wish! Is it then all predestined that God allowed us to taste the divine association for so many seconds, minutes, hours, days!

I gasped for breath and looked ıtently at his divine contour. The celestial aroma, the ethereal music, the rhythmic movement of each of his posture strikingly pronounced his imposing singularity.

শেষাংশ ৫৫ পাতায়

গীতার মর্ম

পরবর্তী অংশ

শ্রী দেবপ্রসাদ রায়

রথী ও মহারথ আদির লক্ষ্মণ - যিনি একাকী দশ সহস্র ধনুর্ধারী বীরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সমর্থ তিনি **মহারথ**, যিনি অনেক বীরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সমর্থ তিনি **অতিরথ**, যিনি একাকী একজন বীরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সমর্থ, তিনি **রথী** ও যিনি নিজ হতে দুর্বলের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, তিনি **অর্ধরথ**।

অনুবাদ - এই পাণ্ডব সেনামধ্যে ভীমার্জুনের ন্যায় মহাধনুর্ধর সুপ্রসিদ্ধ যোদ্ধা বহু বীর রয়েছেন। মহারথ সাত্যকি, বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, কাশিরাজ নরশ্রেষ্ঠ পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ ও শৈব্য, বিক্রমশালী যুধামন্যু, পরাক্রান্ত রাজা উত্তমৌজা, অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, এরা সকলেই মহারথ।

ব্যাখ্যা - যুযুধান - সাত্যকি, শ্রীকৃষ্ণের সারথি। সত্য অন্বেষণই সাত্যকি। সত্যই ভগবানকে বহন করে। ভগবান জীবের সারথি। আর সত্য ভগবানের সারথি।

বিরাট - বহির্জগৎ বিরাট নামে অভিহিত। এই বিরাটের গৃহেই জীবের অজ্ঞাতবাস হয়। মনের ছলনায় যতদিন জীব প্রবঞ্চিত হয়ে আত্মরাজ্যপ্রতিষ্ঠার চেষ্টায় বঞ্চিত থাকে, ততদিনই তার নির্বাসন। যখন প্রাণের অন্তর্মুখী গতি আরম্ভ হয়, ভগবল্লাভের জন্য প্রাণ যখন চঞ্চল হয়ে ওঠে, তখন সে সাধক বিরাট-জগৎ চিন্তায় নিবিষ্ট হয়। অনন্ত সৃষ্টি-বৈচিত্র্যে, সৃষ্টির অনন্ত বিশাল ভাব তাকে আত্মহারা করে ফেলে, সে আপনাকে বিরাট চিন্তা-সমুদ্রে হারিয়ে ফেলে। তার উদ্যম ধনু, কর্ম-শর ইত্যাদি অস্ত্র-শস্ত্র প্রচ্ছন্ন রেখে সে কিছুদিন বিরাটের চিন্তায় বিভোর থাকে। প্রাণে উৎসাহ থাকে না, কর্মে উদ্যম থাকে না, আত্মচেষ্টা বলে তার প্রাণে কোন ভাব স্থান পায় না। সে বিরাট শক্তির বিরাট স্ফুরণে আপনাকে বিরাট শক্তিস্রোতের একটি তৃণ খণ্ড বলে মনে করে - এইটেই অস্ত্রশস্ত্র প্রচ্ছন্ন রেখে বিরাটের গৃহে পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস।

স্থূল জড়শক্তির বিশালতায় যখন সে আপনাকে হারিয়ে ফেলতে থাকে, জড়শক্তির কাছে সে যখন শক্তিহীন নগণ্য বলে আপনাকে বিবেচনা করে, সেই সময়ে প্রাণের সেই দুর্বল ভাবাপন্ন অবস্থায় এক অভূতপূর্ব ঘটনা তার প্রাণের ভিতর ঘটে যায়। নাস্তিকতা এসে তার ইচ্ছাশক্তিকে গ্রাস করতে উদ্যোগী হয় - এইটেই কীচক কর্তৃক দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা।

জীব যত শক্তিকে উপলব্ধি করতে থাকে, শক্তির অনন্ত মহিমায় যত তার প্রাণ বিভোর হতে থাকে, এক বিশাল শক্তির দ্বারাই সৃষ্টিকার্য সমাধা হলে যতই তার প্রাণ সে শক্তি চর্চায় ছড়িয়ে পড়ে, যতই তার বুদ্ধি শক্তি বিজ্ঞানের ভিতরে ঢুকতে থাকে, ততই ধীরে ধীরে তার অজ্ঞাতসারে নাস্তিকতারূপ একটি দস্যুভাব উজ্জীবিত হয়। "এই জড়শক্তি ছাড়া স্বতন্ত্র ঈশ্বর আবারকি? চৈতন্য বলে আমরা যা অনুভব করি, তাও বুঝি এই জড়শক্তিজাত একটি অস্থায়ী বিকাশ," এই রকমভাব তার প্রাণের ভিতর ঢুকতে থাকে।

এইরূপ ভাবের একটি মহাপরীক্ষা তার উপর এসে পড়ে। অনেক মনীষী এই রূপে নাস্তিক হয়ে গিয়েছেন। আত্মোপলব্ধির পথ হতে এইরূপে বঞ্চিত হয়েছেন, সাধনার পথ হতে এইভাবে কিছুদিনের

জন্য অনেক দূরে চলে গিয়েছেন। এইরূপ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপায় হলো জপ। আমাদের প্রাণের ইচ্ছাশক্তি দ্রৌপদী যখন কীচকরূপ নাস্তিকতার দ্বারা এইরূপে স্পৃষ্ট হতে থাকে, তখন কণ্ঠস্থ ভীমরূপী উদান নামে প্রাণশক্তির ভগবন্নাম-জপরূপ অস্ত্রাঘাতে সে নাস্তিকতাকে ধ্বংস করে। এইটেই বিরাট গৃহে ভীমের কীচক বধ।

চেকিতান - কৃষ্ণি বংশীয় যাদব, সাধকের স্বতঃপ্রসূত জ্ঞান।

সৌভদ্র - সুভদ্রা তনয় অভিমন্যু। মরণে নির্ভীকতা এবং তজ্জনিত অহঙ্কার। নির্ভীকতা সাধনা পথের একটি প্রধান সহায়। প্রাণশক্তি এর পিতা। এই নির্ভীকতা একটু অহঙ্কার জড়িত হয়। আমি সাধনপথে অগ্রসর হচ্ছি, আমি সাধক এই ধরণের একটু অহঙ্কারের আবরণ তাকে মায়াআচ্ছন্ন করে। এইটেই মহাভারতে অর্জুনের সঙ্গে নারায়ণী সেনার সংগ্রাম। সাধক যেন সেই সময়ে ঐ ঐশ্বরিক শক্তিলাভের মায়ারূপ নারায়ণী সেনা জয় করতে কুরুক্ষেত্র হতে একটু দূরান্তরে যায়। ঐশী শক্তিলাভের মায়া সে হৃদয় থেকে দূর করে দেয় ঠিক কিন্তু অনুতাপে তার প্রাণ জর্জরিত হয়। তার 'সাধক' বলে অহঙ্কার চিরদিনের জন্য লুপ্ত হয়।

দ্রৌপদেয় - দ্রৌপদীর পুত্রগণ - প্রতিবিন্ধ্য, সুতসোম, শ্রুতকীর্তি শতানীক ও শ্রুতসেন। সাধকের সাধনাজনিত আত্মচরিতার্থতা বা আত্মতৃপ্তির মোহ।

অশ্বত্থামা - দ্রোণাচার্যের পুত্র। জন্মমাত্র অশ্বের মতউচ্চ চীৎকার করেছিল বলে নাম অশ্বত্থামা। আগে বলা হয়েছে, শাস্ত্র-বিহিত ক্রিয়াকাণ্ড বা সাধকের কর্ম মার্গের মায়াই দ্রোণাচার্য নামে অভিহিত, কীর্তি বা কর্মঘোষণা এর আত্মজ। যজ্ঞাদি কর্মের ঘোষণা অবশ্যম্ভাবী, অতি সত্বর তা লোকমুখে চারিধারে প্রচার হয়ে পড়ে। লোক চক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে কর্মমার্গে অবস্থান অসম্ভব। কর্মী বলে কীর্তি একবার জন্মালে অশ্বধ্বনি (হ্রেষা)র মত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ঘোষণা-যশরূপ মণি শিরে ধারণ করে সাধককে চঞ্চল করে তোলে। সাধকের পক্ষে কীর্তিঘোষণা অতীব প্রবল শত্রু। কীর্তি ঘোষণায় একবার মুগ্ধ হলে যশের করতালি একবার চিত্তকে আকৃষ্ট করলে সাধনার পিচ্ছিল সোপান হতে স্খলিত চরণ হয়ে সাধক অনেক নীচে এসে পড়ে। কর্ম ও ঘোষণা - এ দুটি পিতা-পুত্র সম্বন্ধে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ। 'ঘোষণা চাইনা', বললে কর্ম যেন দুর্বল শক্তিহীন হয়ে পড়ে ও বিষাদাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

বস্তুতঃ ঘোষণা কখন মরে না। একবার জন্মালে তা অমরতুল্য হয়ে থাকে। কিন্তু কর্মকাণ্ডের মায়া হতে পরিত্রাণ পেতে হলে বা দ্রোনাচার্যের প্রাণনাশ করতে হলে 'অশ্বত্থামা হত ' অর্থাৎ 'ঘোষণা' চাই না বা ঘোষণা সরল প্রাণে এইরূপ ভাব ফুটিয়ে তুলতে হয়। ক্রিয়াকাণ্ডের মায়ারূপ দ্রোণাচার্য তাহলে নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে এবং সেই সময় অন্তর্মুখী দৃঢ় সঙ্কল্প বা ধৃষ্টদ্যুম্ন তাকে বধ করে।

ঘোষণা সাধকের অজ্ঞাতসারে তার প্রাণের ভিতর প্রবেশ করে। গভীর নিশায় সাধক যখন নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রা যায় অর্থাৎ সাধকের প্রাণশক্তি (পাণ্ডব), ইচ্ছাশক্তি (দ্রৌপদী), সঙ্কল্প (ধৃষ্টদ্যুম্ন) এবং আত্মচরিতার্থরূপ মোহ (দ্রৌপদেয়), এরা সকলে যখন নিশ্চেষ্ট থাকে, সেইসময় যশঃ শীর্ষক অশ্বত্থামা তস্করের মত শিবিরে প্রবেশ করে। মনের সহিত সংগ্রামে, মনপক্ষকে বিধ্বস্ত করে মনকে ভগ্নোরু করে, সাধক যখন ''আমার সঙ্কল্প প্রায় পূর্ণ হয়েছে'', এইরূপ ভাবাপন্ন হয়, এইরূপ ঈষৎ

আত্মশ্লাঘার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, সেই সময়ে কীর্তিঘোষণার মায়া তাকে শেষবারের মত বিধ্বস্ত করে, অজ্ঞাতসারে তার প্রাণের ভিতর ঢুকে তার প্রাণের আত্মচরিতার্থতা বা আত্মতৃপ্তি রূপ পুত্রগণকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলে। সহসা মোহনিদ্রাভঙ্গে সে দেখে - যশোঘোষণা তাকে লুণ্ঠিত করেছে-তাকে বিপর্যস্ত করতে উদ্যত হয়েছে-যশের মায়া তাকে সাধনার পথ থেকে বিচ্যুত করেছে।

তার অন্তর্মুখী ইচ্ছাশক্তি "সাধক হয়েছি" এইরূপ আত্মতৃপ্তি হারিয়ে কেঁদে ওঠে, ইচ্ছার আকুল ক্রন্দন প্রাণের মোহচ্যুতি ঘটে। আবার প্রাণশক্তি জেগে ওঠে। কীর্তি-ঘোষণাকে মারবার জন্য সাধকের প্রাণ সচেষ্ট হয়। কিন্তু যে ঘোষণা হয়ে গিয়েছে, তা অমর, ঘোষণার মৃত্যু নেই। প্রাণ ঘোষণার মাথা থেকে যশোরূপ মণিটুকু কেটে বার করে নিয়ে ইচ্ছাশক্তি কিছুটা সন্তুষ্ট করে অর্থাৎ উচ্চ ঘোষণারূপ অশ্বত্থামার শিরে যশোরূপ মণি যেন আর তার চক্ষে প্রতিভাত না হয়, এইরকম ভাবাপন্ন হয়। যশই ঘোষণার শক্তি। কীর্তি ঘোষণার শিরে যশঃস্বরূপ মণি থাকে বলেই উহা সাধকের বিঘ্ন সাধনে সমর্থ। সেইটুকু বার করে দিতে পারলে কীর্তিঘোষণা আর সাধকের অনিষ্ট করতে পারে না। উচ্চ ঘোষণার শিরে যশের মায়া আছে বলেই সাধকের সাবধান হতে হয়।

সঙ্কল্পরূপ ধৃষ্টদ্যুম্ন ঐ সময়ে নিহত হয়। অর্থাৎ মনোজয় হলে এবং যশের মায়া বর্জন করলে আর সঙ্কল্প বলে সাধকের কিছু থাকে না এবং চরিতার্থতা, অচরিতার্থতা, তৃপ্তি ও অতৃপ্তি বলেও কিছুই থাকে না। যে যশটুকু একবার হয়ে গিয়েছে, সেটুকু অপরিহার্য, ইচ্ছাশক্তি যেন আত্মচরিতার্থতারূপ পুত্র হারিয়ে সেইটুকু নিতে বাধ্য হয়। এইটাই অশ্বত্থামার মণিহরণ এবং চরিতার্থতা বা আত্মতৃপ্তিরূপ দ্রৌপদীতনয়দের নিধন। মহাভারতেও দেখা যায়, অর্জুন অশ্বত্থামার মণি দ্রৌপদীকে অর্পণ করে তাঁকে প্রীতা করেছিলেন।

সাধকের তাই সাবধান বাণী - যশের মায়ায় ভুলো না, জগতের করতালি শুনবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ো না।

তারপর বিপক্ষ সৈন্যের কথা বলে দুর্যোধনরূপ মন নিজ পক্ষের সৈন্য সমাবেশ দ্রোণাচার্যের কাছে বর্ণণা করছেন।

অস্মাকং তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে।। ১/৭

- হে দ্বিজোত্তম, আমাদের পক্ষেও আমার সৈন্যগণের যাঁরা বিশিষ্ট নায়ক, বিশেষভাবে পরিচয়ের জন্য তাঁদের নাম আপনার কাছে বলছি, আপনি শুনুন।।

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তি স্তথৈব চ।। ১/৮
অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানা শস্ত্র প্রহরণাঃ সর্বে যুদ্ধ বিশারদাঃ।। ১/৯

ক্রমশঃ

"ডাক দিয়েছ কোন সকালে"

শ্রীশিবদাস রায়

(পূর্বে প্রকাশিত)

১৯২৩ সালের অক্টোবর। ডাক দিল দেওঘর আকস্মিক ভাবে। ভাগলপুরের বন্ধু সুধা বাঁড়ুয্যে যাবে দেওঘর সেই রাত্রের ট্রেনে। সে ধরে বসল আমাকে তার সঙ্গে যেতে। আশ্বাস দিল সে তার মামার বাড়িতে থাকবে আমার কোনো কষ্ট বা অসুবিধা হবে না - তার মামা সেখানকার খ্যাতনামা ডাক্তার সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়। সহজেই রাজি হয়ে গেলাম এবং তখুনি যাবার জন্য তৈরী হলাম। কেন জানিনা এস্রাজটা না নিয়ে একটা বাঁশের বাঁশি সঙ্গে নিলাম এবং সারা পথ 'পথের বাঁশি' বাজাতে বাজাতে দেওঘর রওনা হলাম।

ভোরে দেওঘর পৌঁছলাম। মনটা তখনও বাঁশির সুরে ভরপুর, বাজিয়ে চলেছি একটার পর একটা গান ভৈরবী ও ভৈঁরোর সুরে। এমন সময় একজন লোক এসে আমাকে জানাল, পাশের বাড়িতে আমাকে কে ডাকছেন। আমাকে আবার এখানে কে ডাকবেন? - ভাবতে ভাবতে পাশের বাড়িতে গিয়ে দেখি, চেয়ারে উপবিষ্ট এক সৌম্য মূর্ত্তি। তাঁকে প্রণাম করে দাঁড়াতেই বললেন -

-কি বাবা তুমি বাঁশি বাজাচ্ছিলে? বড় ভাল লাগছিল তাই ডাকলাম, তুমি কি এখানে থাক?

- আজ্ঞে না, আমি এইমাত্র কলকাতা থেকে আসছি।

আপনি কি এখানে থাকেন?

- না বাবা, আমি এখানে থাকি না, আমার একটি ছেলে এখানে সন্ন্যাসী হয়ে এসেছে, তাকে দেখতে এসেছি।

- সে কোথায় থাকত?

- সে কলকাতায় স্কটিশচার্চ্চ কলেজে পড়ত।

- সে কি অগিল্‌ভি হোস্টেলে থাকত? তার নাম কি মনমোহন?

- সে কি বাবা, তুমি কি তাকে জান?

- সে আমার বন্ধু, আমরা একই হোস্টেলে ছিলাম।

- বল কি বাবা এত বড় আশ্চর্য্য।

তিনি তাঁর স্ত্রীকেও ডেকে পাঠালেন, তিনিও সব শুনে খুব বিস্মিতা হলেন। ঠিক হলো আমরা সকলে মিলে বিকেলে করণীবাদ আশ্রমে যাব।

আমরা বিকেলে যখন আশ্রমে পৌঁছলাম তখন দেখলাম 'বড় মহারাজ' শিবালয়ের চত্বরে বসে। তাঁদের সঙ্গে তাঁকে প্রণাম করে সেখানে কিছুক্ষণ তাঁদের আলোচনা শুনলাম, কিন্তু আমার মন সেখানে বেশীক্ষণ থাকতে চাইল না। সে চাচ্ছিল যাঁকে দেখতে এসেছি তাঁকে দেখতে। একজন লোককে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলল তাঁর দেখা পাবেন না; আর দেখা পেলেও তাঁর সঙ্গে কোন কথা হবে না - তিনি এখন মৌনী।

এমন সময় দেখতে পেলাম দূরে বাগানে কে একজন ফুল তুলছেন। একটু এগিয়ে যেতেই দেখি তিনি আমার দিকে দৌড়ে আসছেন। মুহূর্তেই দাঁড়ালেন আমার সম্মুখে সেই তরুণ তাপস, পরণে

গেরুয়া, সারা অঙ্গে নবারুণ কান্তি। তাঁর দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাতেই বললেন আজ সন্ধ্যায় খুব ভাল কীর্ত্তন আছে না শুনে যাবেন না। এই কথা কটি বলে কোথায় যে অন্তর্হিত হলেন আর তাঁকে খুঁজে পেলাম না।

অনেক বছর পরে, মনে হয় ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে, শান্তিনিকেতনে একদিন খবর পেলাম মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী আসছেন বন্ধু আশু দত্তের বাড়িতে। ছুটলাম তাঁর ওখানে। আশুবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম তাঁর কথা।

- আপনি তাঁকে চেনেন নাকি?

- চিনি বলে তো মনে হচ্ছে না। তবে ঐ নামে একজনকে চিনতাম।

সন্ধ্যায় কীর্ত্তনের আসর বসেছে। আমি যখন এলাম তিনি তখনও আসনে বসেন নাই। কিছুক্ষণ পরে তিনি যখন আসনে এসে দাঁড়ালেন তাঁকে চিনলাম ও স্তম্ভিত হলাম। পিছনের পর্দ্দায় তাঁর ছায়া পড়েছে, ঠিক যেন যীশু খৃষ্ট। আমি তাঁর আগেকার চেহারার সঙ্গে বর্ত্তমান চেহারার মিল খুঁজতে লাগলাম। দেহটি হয়েছে যদিও ঋজু ও দীর্ঘ, মুখের হাসিটি কিন্তু একটুও বদলায় নাই। কেউ বলে না দিলেও তার ঐ মুখের হাসি দেখে আমি তাঁকে চিনতে পারতাম। আর একটুও বদলায় নাই তাঁর কথা বলার ভঙ্গী ও কণ্ঠস্বর। আমার চোখের আড়ালেও যদি তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতাম চিনতে পারতাম সে কার কণ্ঠস্বর।

কীর্ত্তন শুরু হলো। বাইরে দাঁড়িয়ে কীর্ত্তন শুনতে শুনতে মন চলে গেল অতীতে - সেই অগিল্‌ভি হোস্টেলের আনন্দময়, সঙ্গীতময় জীবনে। শান্তিনিকেতন থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে সেখানে গিয়েছিলাম। আমার চিরসঙ্গী এস্রাজটিকে সঙ্গে নিয়ে, আর কণ্ঠে নিয়ে সেখানে-শেখা সেকালের গান। সে গানের বিরাম ছিল না, সময় ছিল না, সে না মান্‌ত পরীক্ষার পড়া না মান্‌ত পরীক্ষার্থীদের তর্জ্জন গর্জ্জন। -"রবিঠাকুর তোমার মাথাটি খেয়েছে" প্রভৃতি বাক্য বর্ষণ।

কীর্ত্তনের আসরে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল আমাদের হোস্টেলের গানের আসর আর একজন মুগ্ধ শ্রোতার কচি মুখ খানি। সে মুখে হাসি লেগেই আছে কিন্তু কোনো কথা নেই। সেই স্বল্পভাষী তরুণ কিশোর হোস্টেলে এসেছিল আমার একবছর পরে অর্থাৎ সে ছিল আমার জুনিয়র। বয়সেও আমার চেয়ে ছোট তাই সে ডাকত আমাকে 'আপনি' বলে আর আমি তাকে ডাকতাম 'তুমি' বলে। কিন্তু গানের ভিতর দিয়ে কি করে যে তার সঙ্গে সখ্যতা গড়ে উঠলো তা ভেবে পাই না। তা ছাড়া সে হোস্টেলে থাকত যেন কোন "দূরের মানুষ"। এই 'দূরের মানুষকে' - গভীর সাধু প্রকৃতির এই লাজুক ছেলেটিকে আমার কাছে এনে দিল কে? গানের টানে সে শুধু আমারই ঘরে আসত আর আমাকেও টানত এক অলখ টানে। একটার পর একটা গান গেয়ে যেতাম সে শুনত তন্ময় হয়ে; আর তার সেই তন্ময়তা সৃজন করত এক দিব্য পরিবেশ আমাকেও নিয়ে যেত কোন এক দিব্য লোকে। সে কিন্তু কোন দিন গান শিখতে চাইত না, এমন কি কোন দিন জানতেও দেয়নি যে তার গানের গলা আছে। তেমনি সে জানতে দেয়নি তার "বাঁধন ছেঁড়ার সাধন"।

তাই একদা শুভ মুহূর্তে একটি চিঠি লিখে সে যখন হোস্টেল থেকে সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করে চলে গেল তখন সেই সবার প্রিয় প্রিয়-দর্শন বন্ধুর উদ্দেশে একটি গান মনের তারে গভীর ভাবে বেজে উঠেছিল।

"সে এল যখন সাড়াটি নাই
গেল চলে জানালো তাই
এমন করে আমারে হায় কেবা কাঁদায় সেজন ভিন্ন"

আজ শান্তিনিকেতনের রাঙা ধূলায় তাঁরই চরণ চিহ্ন পড়েছে - তিনি আজ জগৎ পূজ্য। কীর্ত্তনের শেষে সকলেই তাঁর চরণে প্রণাম নিবেদন করছেন, আমিও নিবেদন করব তাঁর চরণে আমার প্রথম প্রণাম। মনে মনে তার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, আর অপেক্ষা করছি, ভিড়টা কমুক।

ভিড় কমলে প্রণাম করে তাঁর সামনে দাঁড়ালাম, তিনি প্রসাদ দেবার সময় আমার মুখের দিকে চাইলেন।

বললাম - আমি অগিল্‌ভির শিবদাস

- তুমি! তুমি এখানে?

- আমি এখানে বাড়ি করেছি, এখানেই এখন বাস করি।

- কোথায়, কোথায় কোন দিকে বাড়ি করেছ? তিনিও ছাড়বেন না, আমিও বলব না। চলে আসছি, কাণে গেল আশু বাবুদের বলছেন - কি গানই গাইত হোস্টেলে। বীরেন বলছে - ও এখনও গান করে। - তাই নাকি? তার পর দিন দুপুরে সৎ-সঙ্গের শেষে প্রণাম করতেই বললেন

- আজ গান শুনব

- আচ্ছা বেশ

- নিশ্চয়ই?

- হ্যাঁ।

- আপনার শিষ্য সুবোধ বর্দ্ধমান থেকে এসেছে, সে আমার বন্ধু, তার একান্ত ইচ্ছা আপনাকে তাদের বাড়ি নিয়ে যায় আপনাকে নিশ্চই যেতে হবে -

- আচ্ছা তোমাকে পরে জানাব কবে যেতে পারব।

সন্ধ্যায় কীর্ত্তনের আসরে বসেই আমাকে ডাকলেন গান গাইতে। আমি গাইলাম কম্পিত রুদ্ধকণ্ঠে

"এ হরি সুন্দর এ হরি সুন্দর
তের চরণ পর শির নবৈ"

কীর্ত্তনের শেষে প্রণাম করতেই বললেন -

- আশ্রমে কবে যাচ্ছ?

- যাব এক সময়।

- এবারে পূজার সময় চল, বল নিশ্চয়ই যাবে

- না ভেবেই বল্‌লাম যাব।

ক্রমশঃ

সমর্পণ

শ্রীমতী অরুণিমা বসুমল্লিক

বহুদিন তো গেল কেটে বৃথা অন্বেষণে।
হাটে-বাটের ধূলা মেখে, ঘরের মলিন কোণে।
এখন বিহান বেলায় ডাক দিয়ে যায়
পারে যাবি কবে?
ছাড়লো তরী, ফুরালো কড়ি,
নামল যে সাঁঝ ঘাটে
এতদিনে হলো সময়, পড়ল তাঁরে মনে,
সেই যে আমার পরান বঁধু,
হারালেম জনম ক্ষণে।
এবার বাঁধন সবই আলগা করো
ধরো আমার হাত,
দেখাও আমায় পথের আলো,
আর ছেড়োনা সাথ।
ওগো প্রভু, ওগো প্রিয়
শুনাও মধুর বাঁশির তান,
বসি তব চরণ প্রান্তে আজ
গাইব সমর্পণের গান।।

---

৪১ নং পৃষ্ঠার শেষাংশ

একটা ভাবনা এলো। গুরুমহারাজ নিজে মুখে যখন বলেছেন রুটি তরকারি আনতে নিশ্চয়ই তিনি কোথাওতা ব্যবস্থা করেই রেখেছেন। নতুন উৎসাহে আবার এগোতে লাগলাম। বেশ কিছুটা এগোনোর পর একটা গুমটি দোকান পেলাম। সরাসরিই বললাম, 'বিয়াল্লিশটা রুটি লাগবে।' দোকানি বললেন, 'হয়ে যাবে। এটাই এতক্ষণ ধরে ভাবছিলাম, এত রুটি নিয়ে কী করব'। বলে তিনি রুটি গুনতে লাগলেন। ইতিমধ্যে তার পাশের দোকানের লোক এসে বললেন, 'কি রে সন্তোষ, কতক্ষণ থাকবি।'

সন্তোষ বললো, 'এই তো সব হয়ে গেল।'

- 'হয়ে গেল মানে? সব উঠে গেল!'

- 'হ্যাঁরে। এই যে এনার বিয়াল্লিশটা রুটিই লাগবে।'

পাশের দোকানের লোক বললেন, 'দাদা আপনিও বাঁচলেন আমরাও বাঁচলাম।'

'আমি বাঁচলাম সে কথা তো ঠিক আছে, কিন্তু আপনারা বাঁচলেন কি করে?'

দোকানি বললেন, 'আরে দাদা, আজ সন্ধ্যে বেলা আমার স্ত্রী হঠাৎ একগাদা আটা মেখে ফেললো। বললাম, এতো আটা মাখলে কেন? তাতে বললো, কি জানি কেমন করে গামলার জলের মধ্যে আটা পড়ে গেল। এখন বলুন এতো রুটি বিক্রি না হলে কী হবে! এটাই ভাবছিলাম। এমন সময় আপনি এসে ঠিক গোনাগুন্তি বিয়াল্লিশটা রুটিই কিনে নিলেন।'

রুটি কিনে ফেরার পথে বিস্মিত হয়ে ভাবছিলাম 'আহা! গুরুমহারাজের কী বিচিত্র অপূর্ব লীলা!'

ক্রমশঃ

গুরুই কর্ণধার

শ্রী অঞ্জন সাহা

গুরোঃ সেবা পরং তীর্থমন্য তীর্থমনর্থকম্।

সর্ব্বতীর্থাশ্রয়ং দেবী সদ্ গুরুশ্চরণাম্বুজম্।।

গুরুগীতা

গুরুগীতার মতানুসারে এটা আমাদের কাছে স্পষ্ট যে গুরুর চরণসেবার মধ্যে দিয়ে সব তীর্থের পুণ্য অর্জন করা সম্ভব তবু একটা প্রশ্ন কেন জানিনা মনে থেকেই যায় - শুধু কী গুরুর কাছ থেকে আমাদের নিজেদের অর্জনটাই সব? গুরুর প্রতি কী আমাদের কোনও দায়িত্ব কর্তব্য নেই? আমরা কী কখনও ভেবে দেখেছি আমরা তাঁকে কীভাবে আনন্দ দিতে পারি? আমাদের তরফ থেকে তাঁর জন্য কী করা উচিত, যাতে তিনি প্রফুল্ল থাকেন?

যিনি স্থূল শরীর থেকে চৈতন্য শরীর ধারণ করে আজও শতসহস্র শিষ্য ভক্তকে প্রতি মুহূর্তে সকল বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করছেন এবং আনন্দ দান করে চলেছেন তাঁর সেবা আমাদের দ্বারা কী ভাবে সম্ভব? প্রতিটি প্রাণে তাঁর কৃপা ভাষায় অবর্ণনীয়, ইন্দ্রিয়গোচরের ঊর্দ্ধে এবং উপলব্ধির অতীত হলেও স্বীয় জীবনের অনুভূতির দ্বারা তা প্রত্যেকেরই নিজস্ব জ্ঞাতব্য। বহু জন্মজন্মান্তরের সুকৃতির ফলে মনুষ্যজীবনে শ্রীগুরুর আর্বিভাব হয়ে থাকে অথচ তাঁর জন্য আমরা কতটুকুইবা চিন্তা করি? তাঁর সেবাকার্য কী করি? তিনিতো ভগবান - আমাদের দীক্ষাদানকালে যা দিয়েছেন সেগুলি অথবা তাঁর ভোগরাগ দেওয়া বা আশ্রমে নিজেদের উপস্থিতি - এসব যা করি সেগুলোতো আমাদের প্রাথমিক কর্ম এবং অবশ্যকরণীয়, তাতো আমাদেরই মঙ্গলার্থে করে থাকি। তাহলে আমাদের ভাববার বিষয় এই যে আমরা গুরুদেবকে কীভাবে প্রসন্ন করতে পারি?

আমার ধারণা এর প্রকৃত উত্তর হল সদ্‌গুরু দাতা তিনি গ্রহীতা নন, তাই তিনি সর্বদা দিয়েই তুষ্ট - তাঁর প্রদেয় বস্তুর যিনি যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করেন তার প্রতি তিনি সর্বাধিক তুষ্ট হন। তাই গুরুবাবা আমাদের ভিতরে যে নাম বা বীজ দিয়েছেন তা সাধনের দ্বারা এবং তাঁর নামগান কীর্তনকে বজায় রেখেই আমরা তাঁর সেবা করতে পারি। তিনিই বলেছেন সেবা অনেক রকমভাবেই করা যায় - কায়িক, বাচিক, মানসিক ইত্যাদি। যার যেরকম সাধ্য সে সেইভাবেই তাঁকে সেবা করতে পারে আর সকল সেবাতেই তিনি সন্তুষ্ট হন। আমরা গুরুকে পিতা বলেই মানি।

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব

ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব

ত্বমেব বিদ্যা চ দ্রবিণং ত্বমেব

ত্বমেব সর্বং মম দেব দেব।।

জয়গুরু

MOHANANANDA CANCER DIAGNOSTIC & WELFARE SOCIETY
List of Donors (For the Period 25/03/2022 to 13/05/2022

Date	Rt. No.	Name	Amount
25/03/2022	1459	Achyut Narayan Ghosh, Kolkata	5,004
28.03.2022	1426	Manasi Banerjee & Suchinta Banerjee, Shyampur, Durgapur-1	1,001
30.03.2022	1427	Supratik Dey, USA	2,00,000
30.03.2022	1460	A Well Wisher, Kolkata	1,001
15.04.2022	708	Somenath Sarkar & Mausumi Sarkar, Kolkata	10,000
20.04.2022	1428	Shyama Prasad Das, Raniganj	2,000
02.05.2022	1462	Ashis Sengupta, Kolkata	500
02.05.2022	1463	Juthika Ghosh Dostidar, Kolkata	2,000
04.05.2022	1464	Shibani De, Kolkata	200
11.05.2022	1465	Disciples & Devotees of Malda, Malda	27,051
13.05.2022	1429	Golap Mukherjee, Group Housing, Durgapur-12	3,500

'মহাশক্তি'

শ্রীবিলাস

কতরূপে অরূপ তুমি
রূপসাগরে ভাস,
রূপকল্পে সাকার তুমি
নিরাকারে জপ।।
ডুব দিয়ে কত সাধক
পেল কালী শ্যামারে—
রাধা পেল, কৃষ্ণ পেল—
পেলরাধে শ্যামেরে।।
বামা পেল খ্যাপা হয়ে—
রামপ্রসাদ সুরেতে,
কালী বল, শ্যামা বল—
সবই তোমার লীলা যে।
শক্তি আধার যাই বল
গদা পেল কালীকে
সর্বভূতে ঈশ্বর মেলে
জীবে প্রেম দেয় যে।।
চণ্ডী, দুর্গা শক্তি আধার—
কৃপা অন্নপূর্ণা।
শিবশক্তি মহাশক্তি
আধার হল ব্রহ্মা।।

"গান যখন প্রাণের থেকে বেরোয়,
শ্রোতার অন্তর তখন স্তব্ধ হয়ে সেটা শোনে—"
—শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজীর বলা কথা।

শ্রীশ্রী গুরুমহারাজজীর শ্রীচরণাশ্রিত
শ্রীশঙ্কর ভৌমিক ও শ্রীমতী রুণা ভৌমিকের সৌজন্যে

শ্রীগুরুচরণভরসারে

শ্রীগুরুচরণাশ্রিতা কণিকা পাল

কোথা পাব বল রচনা শকতি
মরমের মাঝে কোথা সে ভকতি
গুণগাথা তব রচিবার আশে
বিফল প্রয়াস করি।
জনৈক ভক্তের উক্তি

সত্যিই তাই, আজ বুঝেছি তিনি করালে, তিনি শক্তিদিলে সবার পক্ষেই সবকিছু অসম্ভবকেও সম্ভব করা যায় অনায়াসেই। তবে স্বাধ্যায় প্রয়োজন। ছোট বেলায় যখন শ্রীগুরুর মর্ম বুঝিনি অথচ তাঁকে দেখেছি, প্রণাম করেছি, তিনি মাথায় হাত রেখেছেন তবু যে কোন সমস্যাতে কেন তাঁকে ডাকার কথা একবারও মনে হয় নি? এ তাঁর কেমন লীলা?

জীবনে চলার পথে কত আকাঙ্ক্ষা মনজুড়ে থেকেছে কিছু সফলতা লাভ হলেও বেশির ভাগই অসফলের দলে; তবু 'ভগবানকে কাছে পেয়েও কোন যাচ্ঞা নেই, ভাবছি সবই বুঝি আমি করছি, একবারের জন্যেও ভুলে তাঁর অসাক্ষাতে তাঁকে স্মরণ করছিনা। এই চাওয়া পাওয়ার সমারোহে অভিযান চলে অবাধ গতিতে, তারপর যখন হারানোর বাধায় গতিরোধ হয়, তখনই মনে 'হায় হায়' রবে হিসাব মিলাতে বসি ক্ষয় ক্ষতির - তখনও মনে পড়েনা প্রাণের ঠাকুরকে। নিজে চারিদিকে ছোটাছুটি করে মরি; আর সারাটা জীবনে না জানি কত বাধাবিঘ্ন, শুভ অশুভ সমস্ত রকমের ধাক্কা যখন আরও বাড়তে থাকবে, তখন কী হবে উপায়? সেই অবসাদে বর্তমানও প্রায় ডুবু ডুবু। তখন বাধ্য হয়ে শ্রীগুরুচরণে আত্মসমর্পণের কথা মাথায় আসে - কিন্তু কী করে? ..... জানিনাতো। তিনি যে 'অন্তর্যামী' এতক্ষণ আমার ডাকের অপেক্ষায় ছিলেন।

আবার একটা টুকরো স্মৃতি মনে পড়ল, না লিখে পারছিনা - আমাদের জনৈকা দিদি যখন প্রায় কিশোরী বয়স, তখন সরলভাবে মহারাজজীকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "বাবা, আপনিতো অন্তর্যামী" - উনি উত্তরে বললেন, 'নাতো'। তখন সেই দিদি বলেছিলেন, তবে যে আপনি কীর্তনে বলেন, গুরুমহারাজজীর উত্তর "রসিকতা করে, সে তো গানে আছে তাই বলি"। তখন দিদি বলেন সবগুলিয়ে গেল, গুরুমহারাজ বললেন, "কী বলছ?" দিদিটি বললেন, "তাহলে আপনি সত্যি সত্যিই অন্তর্যামী নন?" তখন বাবা হাসতে লাগলেন।

যাই হোক তখন সবে জগৎ ও সমাজ সম্পর্কে একটু সচেতনতা বাড়ছে, আর ভয়ে আকুল হচ্ছি কী করে এই জগতের ধাক্কা সামলাবো। তবে এটুকু বুঝতে পারলাম সেই রবীন্দ্রনাথের গানের ভাষাতেই বলি - "তোমার হাতে নাই ভুবনের ভার, ওরে ভীরু ....." এই অনুসন্ধিৎসু মন তখন ভাবতে লাগল তাঁকে, যিনি এই ভুবনের ভার নিয়ে বসে আছেন। স্বামী-স্ত্রীর একসঙ্গে দীক্ষা, আমার যত প্রশ্ন ছিল তাঁর শ্রীচরণে উদ্গার করে দিলাম সমস্তটাই, তিনি আমার ডাইরির পাতায় লিখে দিলেন তাঁর আশীর্ব্বাণীটি।

হঠাৎ যেন পড়তে হয় বলে পড়েছিলাম সাহিত্যের ইতিহাসে রামপ্রসাদের উক্তিগুলি এখন যেন গুরুমহারাজ ঠেলা দিয়ে তা মনে করালেন, "মন তুমি কৃষি কাজ জাননা, এমন মানব জমিন রইল পতিত আবাদ করলে ফলতো সোনা", একেইতো মন্ত্রদানের আগে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজীর দেহশুদ্ধি করার আচ্ছন্নতা তখনও কাটেনি, তার উপর একটুকু সময় হলেও তাঁর উপদেশাবলীতে ভুলেই গেলাম, 'কে আমি'? আমারতো কোন নিজস্ব সত্তাই আর আছে বলে মনে হোলনা। কী আশ্চর্য্য তাঁর কৃপা; চোখদুটি জলে ভরে এলো; মনে হোল ক্ষয়ক্ষতির জমিতেই ফলাতে হবে সোনার ফসল যদি তাঁর কৃপাবারি বরষণে করতে পারি আবাদ।

ছিলাম পরগাছার মত সুখসৌধের আওতায়, তিনি একদিন তা ভেঙে দিলেন, এমন দুর্দ্দিন সামনে এসে দাঁড়াল, (যা তাঁরই দেওয়া) পথে টেনে নামিয়ে আবার কোলে তুলে নিলেন, 'কান্নাহাসির দোলদোলানো' এই যে খেলা, জীবনকাণ্ডারী হয়ে তিনি যেন উজান বেয়ে নিয়ে চললেন হাত ধরে তাঁর প্রত্যেকটি সন্তানকে। শ্রীগুরুশক্তি এক নিমেষে ভস্মীভূত করে দিতে পারে তাঁর সন্তানদিগের পাপ-পুণ্য, কর্মফল - এসব কিছুকেই - তবে হ্যাঁ ভরসা করে সমস্ত কিছুই ছেড়ে দিতে হবে তাঁর উপর। আমি না জানি পাপ, না জানি পুণ্য, না জানি কর্মফল - আমি শুধু তোমারই শরণাগত এক তুচ্ছ সন্তান। এখন জীবন সায়াহ্নে এসে স্বীকার করতে আপত্তি নেই -

"প্রভু যা দিয়েছ আমায় এ প্রাণভরি,
খেদ রবেনা এখন যদি মরি।।"

গুরু কৃপাহি কেবলম্

---

৪৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ

I was working at office a few hours before and then the end - result was that he allowed me to taste the divine nectar! The revelation probed deeper and sent a wave down my spine for I realised God wishes all and nothing, absolutely nothing, is in our hands!

The boat journey ended late in the evening. I left ashram around midnight and came back home at Misirpokhra. I told my roommate that I would not go to office next day.

So the next day from morning till midnight Maharaj allowed me to bathe in divine ardour. Somehow I am convinced that innumerable devotees and followers of Guru Maharaj had time and again tasted the essence of divinity through his blessings; though in all probability most of us may not be attuned to recognise the divine attributes that Gurudev continuously pouring down on us!

সম্পাদকীয়

চিরবাঞ্ছিত

অধ্যাত্ম জগতের একটি আদরণীয়, পূজনীয় এই তিথি গুরু পূর্ণিমা। প্রাত্যহিকতার পরিচিত অভ্যস্ত পরিবেশে, হঠাৎ যেন কিসের আহ্বান ভেসে আসে মানুষের প্রাণের বেদনা প্রাণের আবেগ সংবরণ করা অসাধ্য হয়ে পড়ে, যেন কী চাই, কাকে চাই, অথচ "জানিনা কে, চিনি নাই তারে, তারি লাগি রাত্রি অন্ধকারে, চলেছে মানব যাত্রী, যুগ হতে যুগান্তরে", "রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কন্থা বিষয়ে বৈরাগী" - চিত্তের এ বিক্ষোভ প্রশমিত হয় সদ্‌গুরুর আশীর্বাদে। পরম আশ্বাসে তিনি সঠিক নির্দেশনায় এগিয়ে নিয়ে যান শরণাগত, সংকল্পে অটল শিষ্যকে। সদ্‌গুরু স্বয়ং ব্রহ্মজ্ঞ, এই সুদুর্গম পথের সব ঠিকানা অবগত। মা যেমন করে গর্ভস্থ শিশুকে নিজখাদ্যরস দিয়ে রক্ষা করেন ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে পর্যন্ত, গুরুদেবও তেমনি শিষ্যকে স্বনির্ভর হবার পূর্ব পর্যন্ত নিজ অধ্যাত্ম সুধা ও সতর্ক সুরক্ষায় একাধারে মাতা ও পিতার ভূমিকা পালন করেন। গুরু শিষ্য এক অচ্ছেদ্য নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ হন, যেহেতু এই সুকঠিন পথ উভয়েরই, "পরম প্রেমাস্পদকে পাবার। একজন পেয়েছেন আর একজন পেতে চাইছেন।"

গীতা বলেছেন - "মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।" হাজার হাজার মানুষের মধ্যে গুটি কয়েকজন সিদ্ধি প্রাপ্তির জন্য উদ্যোগী; "যততাম্ অপি সহস্রেষু কশ্চিন্ মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ" - উদ্যোগী সহস্রজনের মধ্যেও এক আধজন আমায় তত্ত্বতঃ জানতে পারে" - রামপ্রসাদের ভাষায় "লক্ষে একটা দুটো কাটে" -

ঋষিরা বলেছেন ঈশ্বর লাভের পথ অতি দুর্গম, কঠিন। তবে অলঙ্ঘ্য নয়। সেটা সম্ভব হয় পরম করুণ সদ্‌গুরুর যোগ্য সহায়তায়। সেজন্য গুরুপ্রণাম মন্ত্রে বলা হয়েছে - "অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্ - তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ" - শাস্ত্রে সর্বদা গুরুমহিমা, ভূমিকা ও মর্য্যাদা কীর্তিত। তাই সেই - দুর্লভ মহিমান্বিত গুরুর স্মরণে এই তিথিটি যোগ্য মর্য্যাদায় ও আদরে অন্তরে বরণীয়।

জয় গুরুদেব। গুরুকৃপাহি কেবলম্। ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদম্ মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা।"